Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ

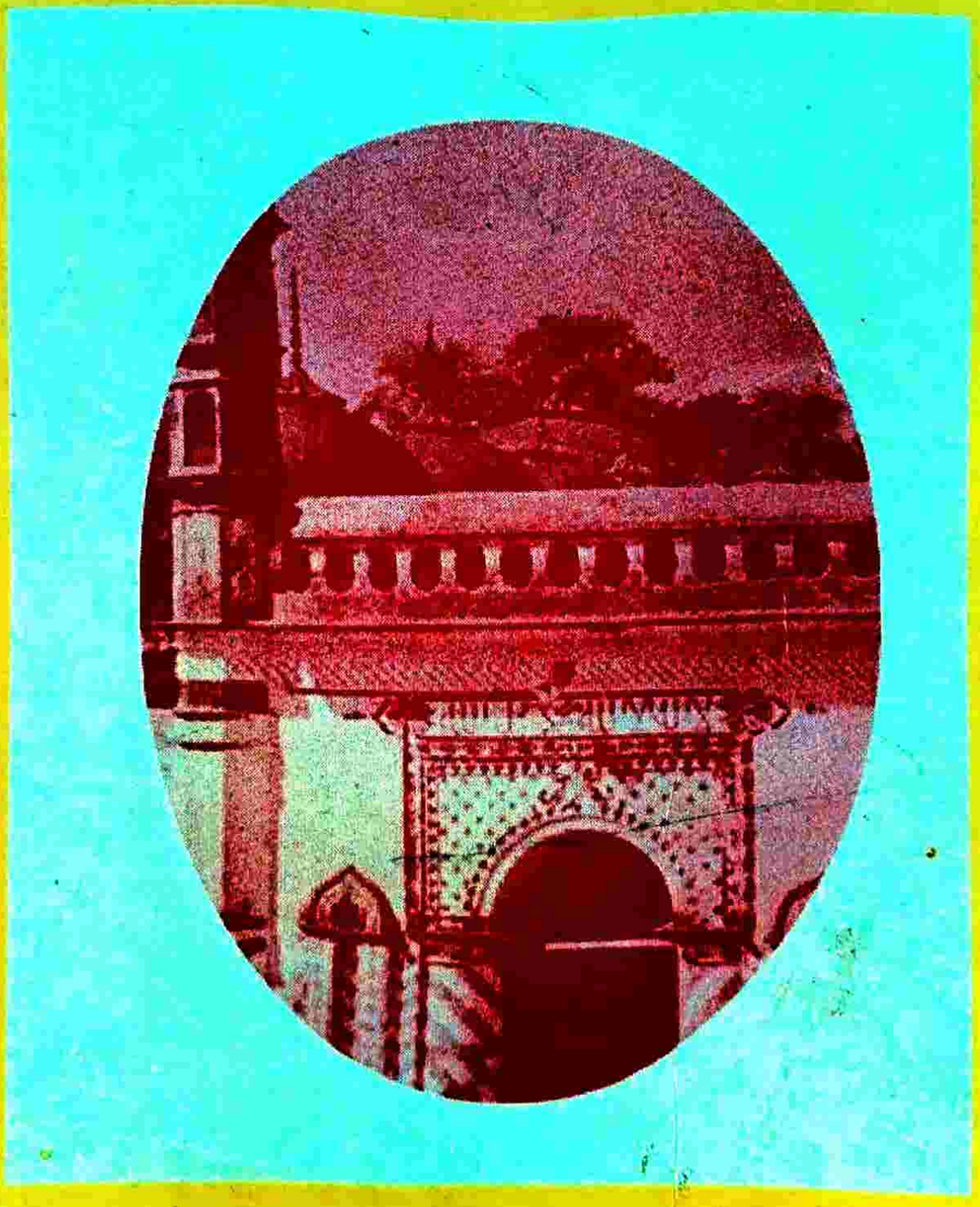

মোঃ আবদুল করিম

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ

মোঃ আব্দুল করিম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে
মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ
মোঃ আবদুল করিম

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৩৯
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৭৭·০৯৫৪৯২
ISBN : 984-06-0645-0

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮
যিলহজ্জ ১৪২২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ৩২.০০ টাকা

SULTANI AMOLE BANGLADESHE MADRASAH SIKHKHAR UTPATTI O BIKASH (The Origin and Development of Madrasah Education in Bangladesh at the Sultanate) : written by Md. Abdul Karim in Bangla and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
March 2002

Price : Tk 32·00 US Dollar : 1·00

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

মহাপরিচালকের কথা

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত একটি দীনী ঐতিহ্যবাহী ধারা। এ ঐতিহ্যের সূতিকাগার হচ্ছে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদ্রাসা মক্কার 'দারুল আরকাম ইবনুল আরকাম' যা হিজরতের পর মসজিদে নববীতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আসহাবে সুফ্ফার জন্য নির্ধারিত স্থানটি ছিল এর একটি ফ্যাকাল্টির মত। ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে মাদ্রাসা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় এবং সুলতানী আমলে তা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। এ সময়ে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তার প্রায় সবগুলোই ঐসব মাদ্রাসায় ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত এ জনপদ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পর এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা, যা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলে এবং অপরটি ধর্মীয় শিক্ষা, যা জনসাধারণের চাঁদায় চলতে থাকে। পরবর্তীতে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারের মঞ্জুরি নিয়ে চালু থাকে এবং স্বাধীনতার পর পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল মাদ্রাসা থেকে পাস করে বের হওয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী দেশের ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেশ ও জাতির সেবায় মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানা আমাদের সচেতনতার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রম ও মেধাসাধ্য গবেষণায় এগিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব মোঃ আবদুল করিম। তিনি তাঁর গবেষণায় মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিক ধারায় উৎপত্তি ও বিকাশের মৌল মাধ্যম সুলতানী আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সন্ধানী পাঠকমহলের সামনে উপস্থাপন করার জন্য লেখককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আশা করি সচেতন ও চিন্তাশীল মহল এ বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এ ধারার পরবর্তী পর্যায়গুলোর গবেষণায় এগিয়ে আসবেন এবং বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিকটি পাঠকদের নজরে আনবেন।

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, এ বইটির মাধ্যমে আগ্রহী পাঠক মহল দেশের একটি উপেক্ষিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্যক অবহিত হতে পারবেন।

আল্লাহ্ আমাদের পরিশ্রমকে সফল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

বিষয়সূচি

ভূমিকা		৭-৯
প্রথম অধ্যায় :	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা	১০-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ধারা	১৭-৩১
তৃতীয় অধ্যায় :	বাংলার মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্যসূচি	৩২-৩৭
চতুর্থ অধ্যায় :	মাদ্রাসার আবাসিক মর্যাদা, সম্পত্তি দান ও আলিমদের মর্যাদা	৩৮-৪২
পঞ্চম অধ্যায় :	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সমাবেশ	৪৩-৪৫
	উপসংহার	৪৬-৪৭
	গ্রন্থপঞ্জি	৪৮-৫১

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

ভূমিকা

ইসলাম সত্যিকারভাবে অগ্রগতির ধর্ম। ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ তাগিদ দিয়েছে, বোধ হয় আর অন্য কোন ধর্মে এরূপ দেওয়া হয়নি। মানুষের দেহ ও মন উভয়ের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের উপরও ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। মহানবী (সা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করা, অন্য কথায় বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়ে গ্রন (তালাবুল এলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লী মুসলীমিন)। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদি সেজন্য এমনকি চীনেও যেতে হয়।" "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর।" তিনি বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের যুদ্ধের পরে তিনি শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে মদীনার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন। "যে সকল বন্দী লেখাপড়া জানত হযরত তাদেরকে বলে দিতেন, 'তোমরা প্রত্যেকে মদীনার দশটি বালককে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, এটাই তোমাদের মুক্তিপণ।"[১] মুসলমানগণ মহানবী (সা)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে চলেছেন। মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি এই সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন এবং বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশেও অতীতে মুসলমান শাসকগণ ও উলামা সম্প্রদায় বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। প্রথম মুসলমান বঙ্গবিজয়ী মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, "যখন মুহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের (চতুষ্পার্শ্বস্থ) অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এবং ঐ অঞ্চলসমূহে (অসংখ্য) মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।"[২] সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজী সম্পর্কে মীনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, "তাঁর বদৌলতে সে রাজ্যের (বাংলার) যে বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তিনি বহু ইবাদতখানা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ওলেমা, শেখ ও সৈয়দদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট তিনি তাঁদেরকে ভাতা প্রদান করতেন। অন্যান্য প্রকারের লোকেরা তাঁর বদান্যতার বদৌলতে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হতেন।"[৩]

বখতিয়ার খলজী শুধু সৈনিক ছিলেন না, তিনি একজন রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন। তাঁর নদীয়া (নওদীয়াহ্) বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীরা ছিল প্রায় সকলেই অমুসলিম,

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

তাদের তুলনায় বিজয়ী মুসলমান ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে অমুসলিম অধ্যুষিত বাংলায় মুসলমান শাসন স্থায়ী হওয়া দুরূহ হবে। তাই তিনি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেন। মুসলমানদের নামায আদায় করার জন্য চাই মসজিদ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য চাই মাদ্রাসা এবং ওলেমা সূফীদের জন্য চাই খানকা। সুতরাং তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা নির্মাণ করেন। শুধু রাজধানীতেই যে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল তা নয় বরং বিজিত এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মিত হয়। তারীখ-ই-ফিরিস্তা সূত্রে জানা যায়, বাংলার সীমান্ত অঞ্চল সুদূর রঙ্গপুর (রংপুর) শহরেও মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা নির্মিত হয়েছিল।[৪] মীনহাজ-ই-সিরাজ সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজীর মসজিদ তৈরির কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি মাদ্রাসা বা খানকা তৈরির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।[৪ক] বলা হয়েছে যে, আলেম, শেখ ও সৈয়দদের বেতন, বৃত্তি বা ভাতা দেওয়া হয়েছে।[৪খ] শেখ ও সৈয়দদেরকে আহল-ই-খাইর বলা হয়েছে। এঁদেরকে আহল-ই-কলমও বলা হতো। অন্যদিকে মুসলমান শাসকবর্গকে বলা হতো আহল-ই-তেগ বা আহল-ই-দৌলত।[৫] আহল-ই-খাইর বা আহল-ই-কলমদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মুসলমান শাসকগণ বরাবরই ভূ-সম্পত্তি, বেতন, বৃত্তি বা ভাতা প্রদান করতেন। বাংলার সুলতানী আমলে (১২০৫-১৫৭৬ খ্রিঃ) এগুলোকে 'ইনাম' 'মিল্ক' এবং 'মদদ-ই-মা'শ বলা হতো এবং মুঘল আমলে (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিঃ) 'সয়ূরগাল' বলা হতো। সুলতানী আমলে সদর-উস-সুদূর এবং শেখ-উল-ইসলাম নামক উচ্চপদস্থ অফিসাররা এগুলোর তদারক করতেন।[৬] যে সকল ওলেমা মাদ্রাসা ও মসজিদ চালাতেন, তাঁদেরকে বিশেষ করে এই সুবিধা দেওয়া হতো। সুতরাং যদিও গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজীর আমলে মাদ্রাসা নির্মাণের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও বোঝা যায়, যে সকল ওলেমা বৃত্তি বা ভাতা পেতেন, তাঁরা শিক্ষাদান কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মুসলিম শাসন আমলে বাঙালি মুসলমানগণ শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন, কেননা এটাকে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ, একটি অনুধ্যান এবং স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার ও মুক্তিলাভের পন্থা হিসেবে গণ্য করতেন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রতি তাঁরা বিরাট সম্মান করতেন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি করতেন। এ জগতে উন্নতির সোপান হলো শিক্ষা। বাংলায় মুসলমানদের শাসন আমলে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। সে যুগে প্রত্যেক মুসলমান যুবকেরই চাকরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারাই সম্ভব হতো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ যুগের বাঙালি মুসলমানগণ ছিলেন তুলনামূলকভাবে অধিক ধনী ও সমৃদ্ধ। ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও সেই পরিমাণে বেশি ছিল। এ সব কারণে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে মুসলিম অধিবাসীদের অগ্রগতির প্রতি বিশেষ নজর রেখে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা দীর্ঘ প্রায় পৌনে চার শ বছরে (১২০৫-১৫৭৬ খ্রিঃ) নির্মিত কোনও মাদ্রাসা এখন আর টিকে নেই। কালের চক্রে এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়াই এগুলো ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণ। সৌভাগ্যবশত শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা আমরা কয়েকটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। মূলত সেগুলোই এই গ্রন্থে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন "বারবকাবাদ অঞ্চলের প্রশাসন ঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এম. ফিল থিসিস রচনায় আত্মনিয়োগ করি, তখনই আমার এই গ্রন্থ রচনার বাসনা জাগে। অতঃপর থিসিসের ফাঁকে ফাঁকে এই বিষয়ের উপর লিখিত তথ্য এবং ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে থাকি। ফলে আমি আরবি, ফার্সী ভাষায় রচিত মূল সূত্রগ্রন্থ এবং সমসাময়িক কালে লিখিত সূফী-দরবেশদের মুকতুবাত (পত্রাদি) ও বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসার শিলালিপির সন্ধান লাভ করি। এ ছাড়াও সম্প্রতিকালে রচিত এতদসংক্রান্ত গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অকৃপণভাবে সংগ্রহ করেছি। আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি এই গ্রন্থ রচনায় আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মিগণ আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি এখানে তাঁদের কাছে দায়বদ্ধ। আশা করা যায়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক, গবেষক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকারে আসবে। পরিশেষে আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর রহমত কামনা করে আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করলাম। আমীন!

তথ্য নির্দেশ

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৬২০-২১।

২. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৯।

৩. ঐ, পৃ. ৫৬।

৪. ফিরিস্তা (আবুল কাশেম) তারীখ-ই-ফিরিস্তা, লাহোর, ১৯০৫, পৃ. ২৯৩।

৫. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২২৪।

৬. I. H. Qwreshi, Administration of the sultanate of Dehli, 4th edi., Karachi, 1958, pp. 176, 190.

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা

পৃথিবীর যে কোন অংশে আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সমষ্টিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে এক বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। মহানবী (সা) বিদায় হজ্জে বলেছেন ঃ "হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছ তারা অনুপস্থিত মুসলমানদের কাছে আমার উপদেশ পৌঁছে দেবে; যারা অনুপস্থিত তাদেরকে আমার উপদেশের কথা বলবে।" মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশ সাহাবা কিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী অনুসারিগণ পালন করার চেষ্টা করেছেন। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ধারা তাঁর নির্দেশিত পথে মুসলমানগণ অব্যাহত না রাখলে ইসলাম কেবলই আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত এবং বিশ্বের দিগ-দিগন্তে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ত না। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচারাভিযানের প্রস্তুতি চলেছিল। জানা যায়, ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মুসলিম নৌবহর সিন্ধুর বন্দরে নোঙর করেছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানরা ভারতের সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল দখল করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারার প্রথম পর্যায় এ সময় থেকেই গণ্য করা যায়। গজনীর সুলতান মাহমুদের (৯৯৭-১০৩০ খ্রিঃ) সতেরবার ভারত অভিযান এই উপমহাদেশে মুসলমানদের সংস্পর্শের দ্বিতীয় পর্যায় বলে বিবেচনা করা যায়। এ পর্যায়ে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের প্রভাব পড়েছিল। ভারতের পূর্বদিকে কনৌজ এবং দক্ষিণদিকে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের অভিযান পরিচালিত হওয়ায়, এসব অঞ্চলের জনগণ মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পায়। তবে স্থায়িভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জনগণ সাধারণভাবে ইসলামের ব্যাপক কর্মসূচি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেনি। ঘুর বংশীয় মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ বিন সাম (যিনি মুহাম্মদ ঘুরী নামে সমধিক পরিচিত) তরাইনের

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রিঃ) চৌহানরাজ পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে এই উপমহাদেশে স্থায়িভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে এই উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার (বরেন্দ্রভূমির) লাখনাবতীতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বাংলায় স্থায়িভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার সাথে তাঁদের কার্যকর কোনও সংযোগ সাধিত হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে তুর্কী সামরিক অভিযান বাংলার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে এখানে স্থায়িভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পরবর্তীকালে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লাখনৌতিতে মুসলিম প্রশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। এই পর্যায়ে উলামা, মাশায়েখ ও সূফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করে জনগণের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে আরবের মুসলমানরা প্রাচ্য, বিশেষ করে চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুসংহত করেছিল।[১] প্রাথমিক যুগের আরব ভূগোলবিদদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আরবের বণিকগণ চীনের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে জাহাজের জ্বালানি সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর, (শাত-আল-গঙ্গা) আরাকান এবং বার্মায় যাত্রা বিরতি করতেন।।[২] এসব বণিকের সাথে ইসলাম প্রচারকরা এসেছেন এবং তাঁরা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাঁদের প্রচার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি এসব ব্যবসায়ীর অনেকেই ইসলামী অভিজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁরাও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বন্দর ও উপবন্দরে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাঁরা সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁদের আমল ও চারিত্রিক গুণাবলীর সংস্পর্শে এসে বাংলার সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। বহিরাগত মুসলমানরা নওমুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর ও বন্দরে ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচিতির এই ধারা শুরু হয়।[৩] এভাবে মালাবার, সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বোর্নিয়ো এবং ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে।

আরো একটি দিক লক্ষণীয়, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল এলাকা অধিকতর আরবীয় প্রভাবযুক্ত; এর কারণ এই যে, এই অঞ্চলসমূহ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

অবশ্যই আরবি ভাষী আরবদের দীর্ঘকাল সান্নিধ্য লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর স্থানীয় উপভাষায় বহু আরবি শব্দ, বাগধারা ও ভাষা-প্রয়োগ পদ্ধতির অজস্র সংমিশ্রণ রয়েছে। এমনকি চট্টগ্রাম অঞ্চলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বাঙালি-কবিদের লেখায়ও আরবি শব্দমালা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। আজও অনেক আরবীয় প্রথা, এমনকি বহু আরবি খেলাধুলা পর্যন্ত সেখানে প্রচলিত আছে। তা হলে ধরে নেয়া যায় যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই সমুদ্রপথে বাংলার সাথে ইসলামের পরিচিতি ঘটে ; মুজাহিদ ও সূফী-সাধকগণ শির্ক ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলে সুবিধাভোগী ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও সামন্তদের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শাহাদতবরণ করেন। সমুদ্রপথে প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব মুজাহিদ ও সূফী-সাধক বাংলায় এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আরব ও পারস্য বংশোদ্ভূত।

বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পূর্বে স্থলপথে বাংলার মধ্য ও পুরাভূমির সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ঘটেছিল কি-না সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তেলিয়াগরহী পথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করা যেত। উল্লেখ্য, এই স্থলপথ দিয়েই আর্য থেকে শুরু করে বিদেশী আক্রমণকারীরা বাংলায় প্রবেশ করেছে। কারণ বাংলার উত্তরে হিমালয় পর্বত, গোটা পশ্চিমাঞ্চল সমুদ্র পর্যন্ত ঘন জঙ্গল (ঝাড়খণ্ড হিসেবে পরিচিত) এবং দক্ষিণে সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করেছে। বাংলায় প্রবেশের জন্য স্থলপথ হিসেবে উত্তর বিহারের দারভাঙ্গাকেও উল্লেখ করা যায়। তবে এ পথ গমনাগমনের জন্যে তেমন সুবিধাজনক ছিল না। কারণ পুনর্ভবা, মহানন্দা ও গঙ্গার ত্রি-ধারা পার হয়ে তবে বাংলার মধ্যভূমিতে প্রবেশ করা যেত। বর্তমানের পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলায় তেলিয়াগরহী (রাজমহল পাহাড় হয়ে) গিরিপথ অবস্থিত। বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পূর্বে এই স্থলপথ দিয়ে বাংলার মধ্যভূমি ও পুরাভূমির সাথে সূফী-সাধকদের যোগাযোগ ঘটেছিল কি-না সে সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়া সমুদ্র উপকূল থেকে দূরত্বের কারণে বাংলার মধ্যভূমির সাথে আরব বণিকদের কোন যোগাযোগ ঘটেনি। তবে উপাখ্যানের সূত্র ধরে বলা যায়, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ, ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার শাহ সুলতান রুমী, বগুড়ার মহাস্থানে মাহমুদ মাহী সওয়ার, বগুড়ার শেরপুরে শাহ তুরকান, পাবনার শাহজাদপুরে মখদুম শাহ দওলা শহীদ, গৌড়ে (লাখনাবতী) মখদুম শাইখ জালাল উদ্দীন তাবরীজী, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মখদুম শাহ গজনবী এবং আরো অনেকে বাংলার পুরাভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বখতিয়ার খলজীর সামরিক বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন।[৪]

বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পূর্বেই যে মুসলমানরা বাংলাদেশের সংস্পর্শে এসেছিল তার আরো বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বাগদাদের বিখ্যাত খলীফা হারুন-অর-রশীদের ১৭২ হিজরীর (৭৮৮ খ্রিঃ) একটি মুদ্রা (দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা) বর্তমান নওগাঁ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

জেলার পাহাড়পুরে (সোমপুর বিহার) বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে।[৫] কুমিল্লার কাছে ময়নামতির ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও কিছু আরবি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬] কিভাবে এই আরবীয় মুদ্রাগুলো বাংলায় এল ? এর পিছনে জোরালো যুক্তি এই যে, এই মুদ্রাগুলো আরব বণিক অথবা ধর্ম প্রচারকগণ খ্রিস্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতকে বাংলায় আনয়ন করেন। তবকাত-ই-নাসিরীর মীনহাজ-ই-সিরাজ বলেন যে, বখতিয়ার খলজী যখন আঠারজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়ায় পৌঁছান তখন (তাঁর পিছনে মূল বাহিনী ছিল) স্থানীয় লোকেরা তাঁর দলকে ঘোড়া ব্যবসায়ী বলে মনে করেছিল।[৭] তাঁরা যে এদের শহর দখল করার অভিপ্রায়ে এসেছে এ সন্দেহ তাদের মনে উদ্রেকই হয়নি। এতে ধারণা হয় যে, মুসলমান ব্যবসায়ীগণ বখতিয়ারের বিজয় পূর্ব যুগেও বাংলায় আগমন করতেন। মীনহাজ-ই-সিরাজ আরো লিখেছেন যে, বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশে অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[৮] এতে ধারণা হয় যে, বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লাখনাবতী বিজয়ের পূর্বেই কতিপয় মুসলিম সাধক এদেশে ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য খানকাহ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এটি বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারায় প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং এই পর্যায়ে মুসলিম শাসক ও সুলতানদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ গড়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, বখতিয়ার খলজী বাংলার লাখনাবতীতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর সে স্থানে এবং তাঁর বিজিত ভূখণ্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর খলজী প্রশাসকগণও (তাঁর) এই নীতি অনুসরণ করেন। বাংলার পরবর্তী স্বাধীন সুলতানদের আমলে এই কার্যক্রম অধিক গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়িত হয়েছে। আবিষ্কৃত শিলালিপি ও লিখিত সূত্র থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মাদ্রাসা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকায় এখানে শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে)। হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের শাসনামলে (১২৯১-১৩০১ খ্রিঃ) ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসা[৯] এবং শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহের শাসনামলে (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ) ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ একই স্থানে দারুল খায়রাত নামে অপর একটি মাদ্রাসা[১০] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (সাতগাঁ অঞ্চল নামে পরিচিত) শিক্ষার দীপশিখা জ্বালিয়ে জনগণের কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার অব্যাহত রেখেছিল। অনুরূপভাবে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (লাখনৌতি অঞ্চল নামে পরিচিত) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত মহিসুন (পঞ্চদশ শতকে বারবকাবাদ নামে পরিচিতি পায়) মাদ্রাসা[১১] জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের (গণেশের পুত্র) শাসনামলে (১৪১৫-১৪৩২ খ্রিঃ) ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসা[১২], সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) লাখনৌতির দরসবাড়িতে নির্মিত দরসবাড়ি মাদ্রাসা[১৩]

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ায় অথবা ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বাঘা মাদ্রসা[১৪] অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলার পূর্বাঞ্চলও (সোনারগাঁ অঞ্চল নামে পরিচিত) পিছিয়ে ছিল না। তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সোনারগাঁ মাদ্রাসা[১৫] প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঐ অঞ্চলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কি-না সে সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমান বসতি গড়ে ওঠার পরে সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল।[১৬] এই মত সন্দেহাতীত নয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হতো। ছাত্রগণ বিনাখরচে পড়াশুনার সুযোগ পেত। উলামা-মাশায়েখ এবং শিক্ষকগণ মদদ-ই-মাশ হিসেবে ইক্‌তা ও লাখেরাজ ভূমি লাভ করতেন। এমনিভাবে জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। বাংলার শাসক ও স্বাধীন সুলতানগণ শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের ধারায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ওয়াইজ ও হক্কানী আলিমগণের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা তাকী-উদ-দীন আল-আরাবী[১৭] এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সোনারগাঁ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শরফ-উদ-দীন আবূ তাওয়ামা[১৮] ইসলামী শিক্ষাদানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া যেসব আলিম তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে আলা-উদ-দীন আলী মর্দান খলজীর শাসনামলের কাজী রুকন-উদ-দীন সমরকন্দী[১৯] এবং গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর শাসনামলে পারস্যের অধিবাসী জামাল-উদ-দীন-এর পুত্র ইমামজাদা জালাল উদ-দীন[২০]-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিককাল থেকে ওয়াইজ ও হক্কানী আলিমগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে একটি স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নতুন জাতি গঠিত হয়। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা (বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্ত্যজ শ্রেণী) ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণবাদ হিন্দুদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। সমাজ জীবন অস্পৃশ্যতার অভিশাপে কলুষিত হয়ে পড়েছিল। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিষ্ক্রিয়তার শিকলে বাঁধা পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য –"একদিকে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাঙালাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধ বিচ্যুত

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলংকারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির; জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান -সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুক্‌তাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ;.....। বখ্‌ত-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং এক শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতির অধোগতির অনিবার্য পরিণাম!" ২১ বখ্‌তিয়ার খলজীর বিজয়ের সমসাময়িক কবি রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্যপুরাণে বাংলায় মুসলমানদের আগমন বিশ্বপ্রভুর এক মহা আশীর্বাদরূপে চিহ্নিত করেছেন।২২ এছাড়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী কবি হালির বর্ণনায়ও পূর্ব ভারতের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'ইধর্ হিন্দ্ মেঁ হরতরক আন্ধেরা'– এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারদিকে অন্ধকার। এ কথার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশের পক্ষেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।২৩ ইসলামের শাশ্বত জীবন-বিধান এবং প্রচারক মুসলমানদের নিষ্কলুষ চরিত্র, অমায়িক আচরণ ও পবিত্র জীবনধারা এ দেশের নিপীড়িত জনগণকে এক শুদ্ধ আদর্শের দিকে আকর্ষণ করেছিল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও একাত্মতার নীতি অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার শিকলে বাঁধা নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণকে ইসলামী জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাই তরবারির ভয়ে নয়, বরং ইসলামের আদর্শ জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ দেশের জনগণ অধিক সংখ্যায় সানন্দচিত্তে ইসলাম কবূল করে সামাজিক বৈষম্য নিরসনে এগিয়ে এসেছে এবং পারলৌকিক কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১. ক. N. Arnold, The preaching of Islam, Lahore, Shaikh Muhammad Asraf, Reprint, 1956, p. 295.

২. ড. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (অনূদিত, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ পৃ. ৪০।

৩. A. K. M. Yaqub Ali, Aspects of Society and culture of the varendra, Rajshahi, M. Sajjadur Rahim, 1998, p. 151.

৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯৫; A. K. M. Yaqub Ali, Aspects of Society and culture of the varendra, pp. 172-180.

৫. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৬. ঐ।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

৭. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৬-২৭।

৮. ঐ, পৃ. ২৯।

৯. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-IV, Rajshahi, varendra research Museum, 1960, pp. 18-21.

১০. Ibid, pp. 28-29.

১১. ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৫, A. K. M. Yaqub Ali, Aspects of Society and culture of the varendra, p. 307; .আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২২৫। মাহীসন্তোষ বর্তমান নওগাঁ জেলার অধীন ধামইরহাট থানায় চৌঘাট মৌজায় আত্রাই নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

১২. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৫; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৯৫; আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২২৫। সুলতানগঞ্জ, বর্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন পদ্মা-মহানন্দার সংযোগস্থলের বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

১৩. অভ্রডরধর্যধমভ্র মত ঈণভথটফ, শমফ-অগ, যয. ১৫৮-১৫৯.

১৪. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, পৃ. ৪৯-৫০; বাঘা সম্পর্কে আবদুল লতিফের বিবরণের জন্য দেখুন ঃ আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৯-২৩।

১৫. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭; আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২২৫।

১৬. A. K. M. Ayyab Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh (Down to A. D. 1980), Islamic Foundation Bangladesh, 1983, p. 12.

১৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ মোঃ আবদুল করিম (আমার), মাহীসন্তোষের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭।

১৯. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, পৃ. ৩৪।

২০. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ৫৭।

২১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২ সন, পৃ. ৪২৬।

২২. রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন, দেখুন ঃ ঐ, পৃ. ৭১০ ; এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট (ক)।

২৩. উদ্ধৃত ঃ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬-৭২৪।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ধারা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম বা বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের যুদ্ধের পরে শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে মদিনার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন। যে সকল বন্দী লেখাপড়া জানত হযরত তাদেরকে বলে দেন, 'তোমরা প্রত্যেকে মদিনার দশজন বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দাও, এটাই তোমাদের মুক্তিপণ'।[১]

মহানবী (সা) আরো বলেছেন, 'চীন দেশে হলেও বিদ্যা অর্জন কর।' মুসলমান শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন এবং বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশেও বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসক ও উলামা সম্প্রদায় বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাদি করেছেন। প্রথম মুসলমান বঙ্গবিজয়ী ইখতিয়ার উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর বিখ্যাত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বলেন, "যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) নওদীয়াহ নগর ধ্বংস করেন এবং লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এবং ঐ অঞ্চলসমূহে (অসংখ্য) মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।"[২] সুলতান গিয়াস উদ-দীন ইওয়াজ খলজী সম্পর্কে মীনহাজ বলেন, "তাঁর বদৌলতে সে রাজ্যের (বাংলা) যে বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তিনি বহু ইবাদতখানা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। উলামা, শেখ ও সৈয়দদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট তিনি তাঁদেরকে ভাতা প্রদান করতেন।"[৩]

মহিসুন মাদ্রাসা

বাংলায় মুসলিম শাসনামলের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে মহিসুনে মাওলানা তাকী-উদ-দীন আরাবীর মাদ্রাসা প্রাচীনতম। বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানাভুক্ত চৌঘাট মৌজাস্থ মহিসুন (পঞ্চদশ শতকে বারবকাবাদ) এখন মাইগঞ্জ নামে পরিচিত। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তাঁর অধীনস্থ একজন উচ্চপদস্থ আমীর, মুহাম্মদ শীরান খলজী দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে মুকাবিলা করে ব্যর্থ হয়ে তাঁর ইক্‌তা মহিসুনে আশ্রয় গ্রহণ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

করেন এবং কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর কবর সেখানে আছে।[৪] ঐ সময় থেকেই মহিসুন মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মাওলানা তাকী-উদ-দীন আরাবী এই জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র পরিচালনা করেন। নামেই মনে হয় মাওলানা তাকী-উদ-দীন আরাবী মূলত আরবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও আলোচনাচক্রের সুনাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিত ও ছাত্রদের আকৃষ্ট করত। বিহারের মানের শরীফের বিখ্যাত সূফী মখদুম শায়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহিয়া মানেরী মাওলানা তাকী-উদ-দীন আরাবীর কাছে মহিসুন শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞান অর্জন করেন। এ তথ্য মখদুম শায়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মানেরীর জ্ঞাতিভ্রাতা শাহ শোয়েব কর্তৃক রচিত 'মানাকিব-আল-আসফিয়া' থেকে জানা যায়।[৫] আরো জানা যায়, শায়খ ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুনে উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। সোহরাওয়ার্দী তরীকার অনেক সূফী এই মহিসুনে সমাহিত আছেন। এ তথ্য জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ আশরাফ সিমনানীর লেখা চিঠি থেকে জানা যায়।[৬] এই সূত্র ধরে বলা যায়, ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে মহিসুন সূফী-দরবেশদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সোনারগাঁ মাদ্রাসা

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার অধীনে সোনারগাঁ ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে একটি ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠরূপে গড়ে ওঠে। মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামা বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার পূত চরিত্র ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও ভারতে সুপরিচিত ছিলেন।

হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিস মাওলানা আবূ তাওয়ামা ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানে এবং সাধারণ বিজ্ঞানে, যেমন রসায়নবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিরাট খ্যাতি নিয়ে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেন ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু তিনি তদানীন্তন সুলতানের (গিয়াস উদ্দীন বলবন-১২৬৬-১২৮৭ খ্রিঃ) ঈর্ষার দরুন তদীয় ভ্রাতা মাওলানা হাফিজ জইন উদ্দীন ও পরিবার-পরিজনসহ বাংলায় আসতে বাধ্য হন। পথে তিনি কিছু দিনের জন্যে মানেরে অবস্থান করেন। মাওলানা আবূ তাওয়ামার অগাধ পাণ্ডিত্য তরুণ শরফউদ্দীন এহিয়া মানেরীকে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং আবূ তাওয়ামার অধীনে জ্ঞানলাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে এহিয়া মানেরী সোনারগাঁয়ের পথে মাওলানার সঙ্গী হন। মাওলানা আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে খানকাহ্ ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] সূফী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ফলে ভারতের সর্বত্র থেকে বহু

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

শিষ্য ও ছাত্র তাঁর কাছে আগমন করেন। ঐ যুগের এই বিখ্যাত পণ্ডিতের অধীনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার অনুশীলন করা হতো। এর ফলে সোনারগাঁ শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সমগ্র ভারতেও শিক্ষার একটি প্রদীপ্ত কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। এখান থেকে বহু বিখ্যাত পীর-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। খ্যাতনামা সূফী-পণ্ডিত মখদুম শরফউদ্দীন এহিয়া মানেরী ছিলেন মাওলানা আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁ শিক্ষা কেন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ত্রয়োদশ শতকের শেষপাদে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সোনারগাঁ বাংলাদেশের গৌরব ছিল। মাওলানা আবূ তাওয়ামা ও মাওলানা শরফউদ্দীন মানেরী একইভাবে বাংলার মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গৌরব ছিলেন। বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবূ তাওয়ামা ৭০০ হিজরী/১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং সোনারগাঁয়ে সমাহিত হন। এ তথ্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা (জৌনপুরের) দরবেশ আশরাফ সিমনানীর চিঠি থেকে জানা যায়।[৮]

সোনারগাঁ বাংলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখে। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী ও পণ্ডিত শেখ আলাউল হক তাঁর নির্বাসনের সময়ে দু'বছর এখানে অবস্থান করেন। একইভাবে তাঁর পৌত্র শেখ বদর-ই-ইসলাম এবং প্রপৌত্র শেখ জাহিদী তাঁদের নির্বাসনকাল এখানে অবস্থান করেন।[৯] প্রসিদ্ধ দরবেশ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বভাবতই সোনারগাঁয়ে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে। এতে দেখা যায় যে, সোনারগাঁয় মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ষোড়শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

হযরত পাণ্ডুয়া

নানা কারণে পাণ্ডুয়া এ উপমহাদেশে শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ স্থানটি আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী, শেখ আখী সিরাজ উদ্দীন উসমান, শেখ আলাউল হক, শেখ নূর কুত্ব আলম, শেখ জাহিদ ও অন্যান্য আরও বহু সূফী পণ্ডিত, উলামা ও শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র ছিল এই পাণ্ডুয়া। সুলতান ইলিয়াস শাহ, জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ, রুকন উদ্দীন বারবক শাহ, শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ ও জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের মত শিক্ষিত ও জ্ঞানী মুসলমান শাসকদের রাজধানীও ছিল এই পাণ্ডুয়া। এঁরা সকলেই শিক্ষা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্যাতনামা পীর-দরবেশগণ ইসলামী জ্ঞানে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে শিক্ষাকে আবশ্যক মনে করতেন। ফলে পাণ্ডুয়ায় তাঁদের খানকাসমূহ স্বভাবতই ধর্মীয় আলোচনা ও ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান কেন্দ্রের পাদপীঠরূপে গড়ে ওঠে। সুলতানগণ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা খানকাগুলোর জন্যে আর্থিক সাহায্য করতেন। ধর্মানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণ পীর-দরবেশদের এই খানকাহ্গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সূফীদের ধর্মোপদেশ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

শ্রবণ করেন। হযরত নূর কুত্‌ব আলম পাণ্ডুয়ায় একটি বড় মাদ্রাসা ও একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করেন।[১০]

পাণ্ডুয়া বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বিরাট ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। শেখ আলাউল হক ঐ যুগের একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পুত্র আজম খান, নূর কুত্‌ব আলম এবং পৌত্ররাও তাঁদের অধ্যাত্মবাদ ও বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। নূর কুত্‌ব আলমের পৌত্র শেখ জাহিদ তাঁর পূত-চরিত্র ও ধর্ম বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ পরিবার ছাড়াও পাণ্ডুয়ায় আরো বহু সূফী-দরবেশ ও ওলেমা ছিলেন, যাঁরা তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শেখ বদরুল ইসলাম ও হযরত বদর আলম ঐ যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডুয়ার এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি জ্ঞানান্বেষণকারীদের বহু দূর দেশ থেকেও আকৃষ্ট করেছিল। এই কেন্দ্র থেকে কয়েকজন প্রসিদ্ধ পীর-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যাঁরা এ উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জীবনে খুব উচ্চস্থান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। মীর সৈয়দ আশরাফ সিমনানী মুসলমানদের জীবনে, বিশেষ করে জৌনপুরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি আলাউল হকের শিষ্য এবং পাণ্ডুয়ার আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ছিলেন। শেখ হোসেন যুক্কর পোষ এবং শেখ নাসিব উদ্দীন মানিকপুরীও পাণ্ডুয়া শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ছিলেন। সূফী পণ্ডিত শেখ হুসাম উদ্দীন মানিকপুরী, লাহোরের শেখ কাফু ও শেখ শামসউদ্দীন তাহির একইভাবে পাণ্ডুয়ার বিশিষ্ট বাঙালি সিদ্ধপুরুষ হযরত নূর কুত্‌ব আলমের কাছে জ্ঞানার্জন করেন।[১১]

রঙ্গপুর (রংপুর)

ইতিহাসবিদ 'ফিরিস্তা'-এর মত অনুসারে রংপুর মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে মুসলমানদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রথম বাংলা বিজয়ের কথা বলতে গিয়ে ফিরিস্তা লিখেছেন, "দার্ সর্‌হদে বাঙালা দর এও ওবে শাহরে নওদীয়া শাহরে মওসুম বে-রঙ্গপুরে বেনা কার্‌দা, দারুল মুল্‌ক খুদ সাক্‌ত; ওয়া মাসাজিদ ওয়া মাদারেসাহ্ ওয়া খান্‌কাহ্ দার আঁ শাহর বিলায়েতে বাজায়ে মুয়ারেদে কুফ্‌ফার বা রাস্‌মে শুআরে ইসলাম বা রওনকে ওয়া বেওয়াব্ তামাম তাঁরী ওয়া তাজাল্লি গার্‌দা নিদ।[১২] অর্থাৎ বাংলার সীমান্তে নওদীয়া শহরের বদলে রংপুর নামে একটি নতুন শহর (বখতিয়ার খলজী) বানালেন এবং এটি হলো তাঁর খোদ রাজধানী। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাসমূহ অবিশ্বাসীদের উপাসনালয়ের স্থানে নির্মিত হলো এবং খলজী (বখতিয়ার খলজী) সেগুলোকে যথাসম্ভব ইসলামী রীতিতে সুশোভিত করার চেষ্টা করলেন।" তবে ফিরিস্তাকে সমর্থনের এ রকম কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই যে, মুহাম্মদ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

বখতিয়ার খলজী রংপুরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মীনহাজের বর্ণনা থেকে, দেবকোট খলজী পরবর্তী লাখনৌতি রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, বিশেষত তাঁর তিব্বত অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে। মীনহাজের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, হোসাম উদ্দীন-ই-ওয়াজ খলজী লাখনৌতি নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন (১২২৭ খ্রিঃ)।[১৩]

যদিও ফিরিস্তার সাক্ষ্য অনুসারে রংপুরকে লাখনৌতি রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তথাপি এটা সম্ভব যে, বখতিয়ার খলজী কর্তৃক সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লাখনৌতি নামটি কেবল রাজধানীর জন্যই নয়, বরং সমগ্র উত্তরবঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হতো। এভাবে রংপুরও লাখনৌতির অন্তর্ভুক্ত। মীনহাজের বর্ণনামতে বখতিয়ার খলজী ও তাঁর আমির-ওমরাহ কর্তৃক লাখনৌতিতে (সমগ্র এলাকায়) একাধিক মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।[১৪] এতে অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে রংপুরেও একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীন সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত ঘোড়াঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও ফৌজদার বা বিভাগীয় সেনানায়কদের সদর দপ্তর ছিল। মুজাহিদ যোদ্ধা শাহ ইসমাইল গাজীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় ঘোড়াঘাট (রংপুর নামেও পরিচিত) বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে ; তিনি সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-'৭৪ খ্রিঃ) শাসনামলে ঐ স্থানের সেনাপতি ছিলেন। শহীদ হওয়ার পর তিনি ঘোড়াঘাটে সমাধিস্থ হন। তাঁর সমাধিসৌধ পরবর্তীতে লোকের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।[১৫] কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে, সেখানকার মুসলমান পরিবারগুলোর প্রয়োজনার্থে এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণস্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কোনো কোনো গবেষক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সমুদ্র বন্দর হিসেবে এর গুরুত্বের কারণে মুসলিম বসতি স্থাপনের সময় থেকে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল।[১৬] পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনাধীনে এলেও সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সে যুগে চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। উচ্চ পর্যায়ের একজন সেনাপতি এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জনসংখ্যা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অধ্যুষিত বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে নিশ্চয়ই মাদ্রাসা অত্যাবশ্যক ছিল। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারিগণ উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। পরাগল খান ও তদীয় পুত্র ছুটি খান হিন্দু শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা তাঁদের দরবারে সাহিত্যসভা করতেন এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অধিকন্তু, চট্টগ্রামে বিপুলসংখ্যক পণ্ডিত ও কবিদের আবির্ভাব ঘটে। এ প্রসঙ্গে দৌলত উজির, বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, মুজাম্মিল, দৌলত কাজী ও আলাওলের

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁদের কাব্যগ্রন্থাবলীতে আরবি, ফার্সী সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়াদিতে তাঁদের গভীর জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, মুসলমান আমলে চট্টগ্রাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল।

বাঘা

বর্তমানে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাঘা থানা সদরের বাঘা গ্রামটি মুসলিম শাসনামলে শিক্ষার একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্র ছিল। বাগদাদের অধিবাসী শাহ দাওলার (প্রকৃত নাম শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ) বসতি স্থাপন ও সেখানে তাঁর খানকাহ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঘা গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

৯৩০ হিজরী/১৫২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের তারিখযুক্ত একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে, সুলতান নসরত শাহ (১৫১৯-৩১ খ্রিঃ) বাঘায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[১৭] বাংলার জনৈক দিওয়ান আবুল হাসানের সেবক ও সঙ্গী আবদুল লতিফ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানটি পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে একজন বৃদ্ধ দরবেশকে দেখতে পান– যাকে তিনি 'হাওদা মিয়া' (প্রকৃত নাম হামিদ দানিশমন্দ) নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "হাওদা মিয়া প্রায় একশত বছরের বৃদ্ধ। তিনি একটি মাদ্রাসা পরিচালনা করেন; সেখানে তাঁর বংশধর ও শিক্ষার্থীগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। কুঁড়েঘর ও মাটির দেওয়াল-বিশিষ্ট গৃহে মাদ্রাসাটি পরিচালিত। খানকাহ্ ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য হাওদা মিয়াকে গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি দান করা হয়েছে।"[১৮] এতে দেখা যায় যে, বাঘার মাদ্রাসাটি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে, আনুমানিক সুলতান নসরত শাহের সময় থেকে চলে আসছিল। অতঃপর গ্রামটি এত বেশি উন্নত হয় যে, একটি বড় ধরনের মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহ মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি কসবা হিসেবে এর প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য, এর গুরুত্ব কেবল খানকাহ ও মাদ্রাসা থাকার জন্যই বেড়ে গিয়েছিল। মাদ্রাসার জ্ঞানান্বেষণকারীদের গভীর অনুরাগ ও সেখানকার শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রশংসা করে আবদুল লতিফ আরো লিখেছেন, "এ শান্তিপূর্ণ নিরাপদ স্থানের অধিবাসীরা কত সুখী, কত ভাগ্যবান এই বনভূমির বাসিন্দা; কারণ অন্য লোকদের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই কিংবা তাঁদের সঙ্গে অন্য লোকদেরও কোনও কিছু করার নেই।"[১৯]

বাঘা মাদ্রাসা এদেশে ইংরেজ আমল পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতেই চালু ছিল। এডওয়ার্ড এডাম ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরীর সময় বাঘায় যান এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখেন।[২০] এডাম তাঁর রিপোর্টে মাদ্রাসাটিকে বহুদিনের একটি বৃত্তিভোগী প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন। মাদ্রাসায় ফার্সী এবং আরবি উভয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। ফার্সী বিভাগের শিক্ষক ছিলেন নিসার আলী, বয়স প্রায় ষাট বছর। তাঁর মাসিক বেতন ছিল আট টাকা।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

তাছাড়া তিনি থাকা, খাওয়া, ধোপা খরচ, ব্যক্তিগত খরচ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেতেন। এবং প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের সময় উপহারাদি পেতেন। আরবি শিক্ষক ছিলেন আবদুল আজীম, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তাঁর মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা এবং তিনিও ফার্সী শিক্ষকের মত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতেন। ফার্সী বিভাগে ৪৮ জন ছাত্র ছিল। ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে থাকা, খাওয়া, পোশাক, ধোপা খরচ এবং কাগজ-কলম ইত্যাদি পেত। ফার্সী বিভাগে ছাত্ররা অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে কুরআন পাঠ এবং পন্দনামা, আমদনামা, গুলিস্তান, বোস্তান, ইউসুফ-জোলায়খা, জামি-উল-কওয়ানীন, ইনশা-ই-ইয়ার মুহাম্মদ, সিকান্দরনামা, বাহার দানিশ এবং আবুল ফজল রচিত পুস্তকগুলো পাঠ করত। আরবি বিভাগে ছাত্র ছিল মাত্র সাতজন। আরবি বিভাগের ছাত্ররাও ফার্সী বিভাগের ছাত্রদের মত সকল সুযোগ সুবিধা পেত। আরবি বিভাগের পাঠ্য বই-এর মধ্যে ছিল মিজান মনশায়েব, সরফমীর, তসরীফ, মে' তামেল এবং শরহ-ই-মে' তামেল।

অতএব বাঘা মাদ্রাসা একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ছাত্র-শিক্ষক সকলে মাদ্রাসা চত্বরে থাকত। মনে করা দরকার যে, বাঘা পরিবার দু'বার লাখেরাজ সম্পত্তি লাভ করেন। প্রথমবার দান করেন গৌড়ের জনৈক সুলতান, দ্বিতীয়বার দান করেন যুবরাজ শাহজাহান। এর উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) ঐ পরিবারের ভরণ-পোষণ, (খ) জনগণের ধর্মীয় কাজের ব্যবস্থা বা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনা এবং ধর্মীয় উৎসব পালন, (গ) মুসলিম সূফী-সাধক এবং গরীব-দুঃখীদের আতিথেয়তা এবং (ঘ) মাদ্রাসার রক্ষণাবেক্ষণ করা। বাঘা পরিবারের বিশাল লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি (২২+৪২টি মৌজা) মদদ-ই-মাআশ (জীবিকার সাহায্য) রূপে পরিচিত ছিল। ইংরেজ সরকার বাঘার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে বহাল রাখেন।

বাঘার এই প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্সহ ইসলামী অভিজ্ঞানের সকল বিষয়ের উপর পাঠদান করা হতো। এখানে ইল্মে তাজবীদ ও কুরআন মজীদ হিফজ করারও ব্যবস্থা ছিল। কেবল বাংলা নয়, বরং বাংলার বাইরের শিক্ষার্থীরা বাঘার মাদ্রাসায় ইল্মে দীনের পাঠ সমাপ্ত করে উচ্চতর শিক্ষার সনদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার এবং ইল্মের চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। প্রখ্যাত আলিম ও ইসলামী অভিজ্ঞানে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মাওলানা শের আলী এই মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাঘাতেই কবরস্থ হন। এছাড়া দু'জন ইরানী শিক্ষকের কবরও সেখানে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, দেশ-বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। শিলালিপি সূত্রে প্রাপ্ত বাংলার মাদ্রাসাগুলোর পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

ত্রিবেণী (সাতগাঁ)

শিলালিপি সূত্রে যে সব মাদ্রাসার কথা জানা যায় তার মধ্যে সাতগাঁয়ের ত্রিবেণীতে (ফিরোজাবাদ নামে পরিচিত) নির্মিত মাদ্রাসা দু'টি প্রাচীনতম। ৬৯৮ হিজরীতে (১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কাউসের শাসনামলে (১২৯১-১৩০১ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, ঐ সময়ে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়[১১] এবং ঐ একই স্থানে ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহের শাসনামলে (১৩০১-১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপিতেও একটি মাদ্রাসা স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে।[১২]

প্রথম শিলালিপিতে জাফর খানকে ঐ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কাজী নাসির মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি এর জন্য অর্থ ব্যয় করেন বলে জানা যায়। দ্বিতীয় শিলালিপিতেও জাফর খানের আদেশে মাদ্রাসা নির্মিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাফর খান সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কাউস এবং সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ উভয় সুলতানের অধীনে ত্রিবেণীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ত্রিবেণী অঞ্চল মুসলমান সুলতানদের অধিকারে আনেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে জাফর খানের উপাধি খান-ই-জাহান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় তিনি উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। উল্লেখ্য, দু'খানি শিলালিপিই জাফর খান উৎকীর্ণ করান।

৬৯৮ হিজরীতে (১২৯৮ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

قال عليه السلام : تعلموا العلم - فان تعلمه لله طاعة و طلبه عبادة و مذاكرته تسبيح وتحسينه لله مسرة -

(١) ..... لنصب دروس و اتحاف مدارس

(٢) سليل القضاة النصير محمد - يلقب بالبرهان قاضى الحمارس

(٣) و قد انفق الاموال فى الدرس حسبة - ليرضى به الرحمن عن كل دارس

(٤) فيرزق اهل الفضل من عرض ماله - لتدريس علم الشرع فوق الطنافس

(٥) ..... لاظهار دين الله بين الغطارس

(٦) ..... ترس من الدرس يتقى - به الشر مالا يتقى بالتارس

(٧) بنوبة سلطان السلاطين عهده - حكى عن عهود الجم كل المجالس

(٨) ملاذى الورى ركن الدنى كيكاؤس - يدوم له الدنيا دوم الهواجس

(٩) ..... تبدى ظفر خان هزبر العنابس

(١٠) بفتح بلاد الهند فى كل ركضة - و تشييد بناء الخير بعد الدوارس

(١١) وقلع علوج الكفر بالسيف والقنا - و بذل كنوز المال فى كل بائس

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

(١٢) واحى بقاع الشرع من بعد ميته - بتلخيص برهان العلوم الفرايس

(١٣) فيرجو من الفقهاء بانيه دعوة - لتثبيت ايمان اوان الحنادس

(١٤) جزا الله خيرا انه محض رحمة - و بر و احسان لا هل القلانس

(١٥) و تعظيم علماء الشريعة جملة - لاعلاء اعلام العمالس

(١٦) بتاريخ حاء من سنين و صادها - و خاء حروف الوفق حسبان قائس

অনুবাদ ঃ "মহানবী (সা) বলেছেন, বিদ্যা শিক্ষা কর, কারণ আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য বিদ্যা শিক্ষা আনুগত্য প্রদর্শন করা, বিদ্যার অন্বেষণ করা ইবাদত, বিদ্যার চর্চা করা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা আনন্দদায়ক।"

১. শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য.....

২. কাজীদের উত্তরাধিকারী আল-নাসির মুহাম্মদ, যিনি তাঁর যুক্তির জন্য ব্যাঘ্র কাজী নামে পরিচিত ছিলেন।

৩. তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে শিক্ষার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন, যাতে দয়ালু আল্লাহ প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিদানের জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন।

৪. তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তিনি আহল-উল-ফজল-এর জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে ইসলামী আইন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাছাড়া তিনি কর্মচারীদের গালিচাও দিয়েছেন।

৫. উদ্ধতদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

৬. শিরস্ত্রাণধারীরা যে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে না, শিক্ষা সেরূপ বিপদ থেকে মুক্ত করে।

৭. সুলতানদের রাজত্বকালে, যাঁর রাজত্ব জমশেদের রাজত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৮. মানবজাতির আশ্রয়স্থল, পৃথিবীতে শান্তির নীড়; (তাঁর নাম) কায়কাউস, মানুষের মনে যতদিন থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব স্থায়ী থাকুক।

৯. সিংহদের সিংহ জাফর খান আবির্ভূত হলেন।

১০. প্রত্যেক অভিযানে ভারতের শহরগুলো অধিকার করে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুদ্ধার করে।

১১. বিধর্মীদের মধ্যে যারা অবাধ্য, তাদের তিনি তাঁর তরবারি ও বর্শার সাহায্যে ধ্বংস করেছেন এবং তিনি দুস্থদের সাহায্যের জন্য তাঁর সম্পদ ব্যয় করেছেন।

১২. তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুদ্ধার করেন, তাঁর খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান এবং যুক্তির সাহায্যে (এই মাদ্রাসা) নির্মাণ করেন।

১৩. তিনি অন্ধকারে (মৃত্যু এবং কবরের অন্ধকার) তাঁর ঈমান অটুট থাকার জন্য আইনবিদদের (ফুকাহা) দোয়া কামনা করেন।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

১৪. আল্লাহতা'আলা তাঁকে (নির্মাতাকে) পুরস্কৃত করুন, আল্লাহতা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ধর্মপ্রাণ লোকদের প্রতি।

১৫. এবং তিনি শরীয়তের আলিমদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল যাতে পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

১৬. এই মাদ্রাসা ৬৯৮ হিজরী (১২৯৮ খ্রিঃ) নির্মিত হয়।

৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও মাদ্রাসা নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এর পাঠ নিম্নরূপ ঃ

الحمد لولى الحمد - بنيت هذه المدرسة المسماة دار الخيرات فى عهد سلطنة والى المبرات - صاحب التاج والخاتم ظل الله فى العالم المكرم الاكرم الاعظم - مالك رقاب الامم شمس الدنيا والدين المخصوص بعناية رب العالمين - وارث ملك سليمان ابى المظفر فيروز شاه السلطان خلد الله سلطانه

بامر الخان الاجل الكريم المبجل الجزيل العطا الجميل الثنا نصير الاسلام ظهير الانام شهاب الحق والدين معين الملوك و السلاطين مربى ارباب اليقين خانجهان ظفر خان اظفره الله باعدائه وعطفه على اوليايه - فى غرة المحرم المضاف الى سنة ثلث عشر و سبعمائه -

এই শিলালিপির অনুবাদের সারকথা এই যে, এই মাদ্রাসা 'দারুল খয়রাত' (House of Benevolence) নামে পরিচিত এবং এটি ১লা মহররম, ৭১৩ হিজরীতে (২৮শে এপ্রিল, ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ) খান-ই-জাহান জাফর খানের আদেশে নির্মিত হয়। যেহেতু মাদ্রাসা দু'খানি ধ্বংস হয়ে গেছে, সেহেতু এগুলোর স্থান নির্দেশ আর সম্ভব নয়। প্রথম শিলালিপিটি জাফর খানের মসজিদের দেওয়ালে এবং দ্বিতীয় শিলালিপিটি জাফর খানের মাজারের দেওয়ালে প্রোথিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে ধারণা করা হয়, একই স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মাজার নির্মিত হয়েছিল।[২৩] এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ত্রিবেণী অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসার পরে সেখানে জাফর খান এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (Religious Complex) নির্মাণ করেন, ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে সেখানে মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। এই মাদ্রাসা দু'টি সাতগাঁ অঞ্চলে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করে এবং ঐ এলাকায় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুলতানগঞ্জ

বর্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন সুলতানগঞ্জ স্থানটি রাজশাহী শহর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৩২ কিঃ মিঃ দূরত্বে রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ পাকা সড়কের পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এই স্থানকে জাহানাবাদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার সুলতানী আমলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট ছিল।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

সুলতানগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যা এর ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুমান করা যায়। স্থানটি স্থানীয়ভাবে 'কেল্লা বারুইপাড়া' নামে পরিচিত। এখানে সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (রাজা গণেশের পুত্র) কর্তৃক নির্মিত একটি মাদ্রাসার কথা জানা যায়। এই সুলতানের ৮৩৫ হিজরীর (১৪৩১/৩২ খ্রিস্টাব্দ) সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে একটি মসজিদ নির্মাণের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[২৪] কিন্তু শিলালিপির ভাষা দৃষ্টে আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসাও ছিল।[২৫] এই শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

১) بسم الله الرحمن الرحيم - فالله خير حافظا و هو ارحم الراحمين - قال النبى صلى الله عليه وسلم - من بنى المسجد فى الدنيا بنا الله اربعين قصرا فى الجنة

২) قال الله تعالى و اقيموا الصلواة طرفى النهار و زلفا من الليل - ان الحسنات يذهبن السيئات - ذلك ذكرى للذاكرين - و اصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين

৩) قال النبى صلى الله عليه و سلم خير البقاع مساجدها (و) شر البقاع اسواقها- و قال صلى الله عليه و سلم من انفق درهما على طلب العلم فكانما انفق خيلا من الذهب الاحمر فى سبيل الله تعالى

৪) بنى هذا المسجد و تم فى زمان امير جلال الدنيا و الدين ابو المظفر محمد شاه سلطان خلد ملكه - و البانى لهذه الخيرة ملك صدر الملة و الدين سلطانى امير دوده بن سوقيه خاص طال عمره - و ابتداءها فى يوم الاحد - الخامس من جماد الاول سنة خمس وثلثين وثمانمائة

অনুবাদ ঃ ১ম সারি–আল্লাহ, দয়ালু ও দাতা-এর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষাকর্তা ও নিরাপত্তা দানকারী এবং করুণা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র অফুরন্ত করুণা দানকারী। মহানবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে চল্লিশটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।"

২য় সারি– দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু সময় তুমি নামাযকে প্রতিষ্ঠিত কর। অবশ্যই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূরীভূত করে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য ওটা উপদেশ এবং ধৈর্যধারণ কর, অবশ্যই আল্লাহতা'আলা সৎ কাজের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

৩য় সারি–মহানবী (সা) বলেছেন, "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান আল্লাহর মসজিদসমূহ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজারসমূহ।" এবং মহানবী (সা) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এক দিরহাম খরচ করে, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় লাল স্বর্ণের একটি ঘোড়া ব্যয় করে।"

৪র্থ সারি–এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু এবং শেষ হয়েছিল আমীর জালাল-উদ্দুনিয়া-ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ শাহ সুলতানের আমলে। তাঁর সাম্রাজ্য

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দীর্ঘস্থায়ী হোক। এই মহৎ কাজের নির্মাণকারী ছিলেন সুলতানের বিশেষ প্রিয়ভাজন, দশজন পানি সরবরাহকারীদের নেতা মালিক সদরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন। তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হোক। তিনি এই ইমারতের নির্মাণ কাজ ৮৩৫ হিজরীর (১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ) জমাদিউল আউয়াল মাসের ৫ তারিখ রবিবারে শুরু করেছিলেন। এখানে যদিও মসজিদ নির্মাণের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে, শিলালিপির ভাষায় মনে হয় যে, মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসাও সংযুক্ত ছিল। মসজিদ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা বা বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত মহানবী (সা)-এর হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে আরো দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত হাদীসে তালিব-উল-ইল্‌ম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাখানি আবাসিক প্রতিষ্ঠানরূপে নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয়ত এই প্রতিষ্ঠানকে 'খয়রাত' বলা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, মাদ্রাসা নির্মাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন রাখা হয়েছে, যাতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার্থীদের জন্য মাদ্রাসা গড়ে উঠতে পারে।

দরসবাড়ীর দু'টি মাদ্রাসা (লাখনৌতি)

বাংলার মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে, গৌড় নামে পরিচিত লাখনৌতি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত হয়। লাখনৌতি অঞ্চলে ওমরপুর গ্রামের সন্নিকটে দরসবাড়ী নামক স্থানের আশেপাশের ধ্বংসস্তূপ হতে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) মাদ্রাসা নির্মাণ সম্পর্কিত দু'টি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপি দুটিতে উল্লিখিত মাদ্রাসার স্থান শনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। তবে দরসবাড়ী মসজিদের পূর্বপাশে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে একটি প্রকাণ্ড মাদ্রাসা কমপ্লেক্স হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।[২৬] উল্লেখ্য, 'দরসবাড়ী' নামের অর্থই পাঠশালা। মাদ্রাসা নির্মাণ সম্পর্কিত দু'টি শিলালিপির তারিখ যথাক্রমে ৯০৭ হিজরী (১৫০২ খ্রিস্টাব্দ) এবং ৯০৯ হিজরী (১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ)। ৯০৯ হিজরীর শিলালিপিটি মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গেছে এবং সে কারণে ৯০৯ হিজরীর শিলালিপিটি দরসবাড়ী মাদ্রাসার শিলালিপি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৯০৭ হিজরীর শিলালিপিটি এই অঞ্চলের অপর কোনও মাদ্রাসার শিলালিপি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিলালিপি দুটির পাঠ নিচে দেয়া হলো ঃ

৯০৭ হিজরীর শিলালিপি ঃ[২৭]

قال النبى صلى الله عليه و سلم - اطلبوا العلم و لو بالصين - امر ببناء هذه المدرسة الشريفة السلطان الاعظم الاكرم سيد السادات منبع السعادات المجاهد فى سبيل الله المنان الفاتح للكامرو والكامته بعون - الرحمن علاؤ الدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان الحسينى

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

خلد الله ملكه و لتدريس علوم الدين و تعليم احكام اليقين - راجيا من الله الامر العظيم وسائلا منه رضوانه القديم - فى غرة شهر رمضان سنة سبع و تسعمائة -

অনুবাদ ঃ নবী করীম (সা) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি তা চীন দেশেও গিয়ে করতে হয়।" আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী, করুণাময়ের সাহায্যে কামরূপ ও কামতা বিজয়ী, মহান সুলতান, সাইয়েদগণের সাইয়েদ এবং শুভ কাজের উদ্যোগী আলা উদ্দীন আবুল মুজাফফর হোসেন শাহ আস'সুলতান যিনি হযরত হুসাইনের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত এই মর্যাদাসম্পন্ন মাদ্রাসা নির্মাণের আদেশ প্রদান করেছেন। দীন বা ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় বিদ্যা এবং ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত সব বিষয়ের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আল্লাহর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভ ও তাঁর (আল্লাহতা'আলা) সন্তুষ্টি হাসিলের বাসনা নিয়ে ৯০৭ হিজরীর (১৫০২ খ্রিস্টাব্দ) রমযান মাসের ১ তারিখে এই মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছে।

৯০৯ হিজরীর শিলালিপি ঃ[২৮]

الحمد لله الذى اعطى لمن اوى العلماء حظا جسيما و فضل من احسن اليهم فضلا عظيما وعظمهم تعظيما و كرم من نصرهم تكريما و الصلواة على رسوله الذى قال من اوى عالما اواه الله يوم القيامة و اله و اصحابه الذين فازوا بهذه الدرجة السليمة و بعد فان السلطان المنصور بنصره السبحانى علاء الدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان بن سيد اشرف الحسينى ادامه الله فى هذه المملكة مع الاولاد و الحفدة الى يوم القيامة - بنى هذه المدرسة اللطيفة الجميلة فى سنة تسع و تسعمائة -

অনুবাদ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আলিমদের আশ্রয়দানকারীদের সৌভাগ্য দান করেন, যারা তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদের অনুগ্রহ করেন, তাঁদের সম্মানকারীদের সম্মান দেন এবং তাদের সাহায্যকারীদের উচ্চ মর্যাদা দেন। আল্লাহর রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ যিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলিমদের আশ্রয়দান করেন আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আশ্রয়দান করবেন এবং তার সহচর ও বংশধর এই নিরাপদ মর্যাদা লাভ করবে।" অতঃপর আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এই বিজয়ী সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাফফর হোসেন শাহ বিন সাইয়েদ আশরাফ আল-হোসেনকে আল্লাহ সন্তান-সন্ততি ও বংশধরসহ এই সাম্রাজ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন। তিনি এই বৃহৎ ও মনোরম মাদ্রাসা ৯০৯ হিজরী (১৫০৩ খ্রিঃ) সনে নির্মাণ করেন।

দু'টি শিলালিপিতেই মাদ্রাসা নির্মাণের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই দু'টি শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। ৯০৭ হিজরীর শিলালিপিতে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এতে আল্লাহর দীনের হিফাযত এবং মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দূরদেশে গিয়ে জ্ঞান অনুশীলনের তাকিদ করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে মাদ্রাসার মুখ্য পাঠ্যসূচির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো ধর্ম বিশ্বাসের জন্য আকাইদ ও ফারাইস বিষয়ক আলোচনা এবং দীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক শাস্ত্র।

৯০৯ হিজরীর শিলালিপিতে যে মাদ্রাসার উল্লেখ আছে তাতে ধর্মীয় ও লৌকিক সকল বিষয় পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ উৎকীর্ণ লিপিতে মাদ্রাসার যে দু'টি বিশেষণ 'বৃহৎ' ও 'মনোরম' ব্যবহৃত হয়েছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তনকে বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। একটি সমাজের সুগঠন ও পরিশীলিত করার পিছনে উলামা সম্প্রদায়ের অবদান থাকে খুব বেশি। এই শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, আলিম, পণ্ডিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে স্ব স্ব পরিমণ্ডলে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৬২০-২১।
২. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৯।
৩. ঐ, পৃ. ৫৬।
৪. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ৪৮।
৫. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ২০৫।
৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬, পৃ. ৫০৮।
৭. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬।
৮. আশরাফ সিমনানীর পত্রের জন্য দেখুন ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮।
৯. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৯।
১০. ঐ, পৃ. ২০৯।
১১. ঐ, পৃ. ২০৯-২১০।
১২. ফিরিস্তা (আবুল কাশেম), তারীখ-ই-ফিরিস্তা, লাহোর, ১৯০৫, পৃ. ২৯৩, উদ্ধৃত ঃ মুহম্মদ আবূ তালিব, উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী, গ্রন্থকার, ১৯৭০, পৃ. ৫০।
১৩. তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ৫৫।
১৪. ঐ, পৃ. ২৯।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

১৫. G. H. Damant, "Notes on shah Ismail Ghaji..... foundat Khanta Duar, Rangpure", I. A. S. B. 1974,vol-43, pp. 215-239.

১৬. A. K. M. Ayyab Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh (Down to A. D. 1980), Islamic Foundation, Bangladesh, 1983, p. 12.

১৭. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, Rajshahi, varendra Research Museum, 1960, pp. 212-214.

১৮. আবদুল লতিফের বিবরণের জন্য দেখুন ঃ আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৯-২৪।

১৯. ঐ।

২০. এডওয়ার্ড এডামের বাংলার প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। তন্মধ্যে দেখুন ঃ ঐ, পৃ. ২০-২১।

২১. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, pp. 18-21.

২২. ঐ, pp. 28-29.

২৩. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২২৮।

২৪. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, pp. 46-48.

২৫. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২, পৃ. ৯৫; আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২২৫।

২৬. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, পৃ. ১০২।

২৭. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, p. 159.

২৮. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, পৃ. ১০৩-১০৪।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্যসূচি

পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত শিলালিপি ও বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের মুসলিম শাসনামলের মাদ্রাসাসমূহে পঠিতব্য বিষয় ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে একটি আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস চালান যায়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য ও সামাজিক সম্মানের বিষয়রূপে পরিগণিত হতো। তাদের মধ্যে শিক্ষার জন্য গভীর স্পৃহা ছিল এবং এর জন্য ব্যয় করার ক্ষমতাও তাদের ছিল। মুসলমানগণ বিশেষ করে শাসনকর্তা, রাজকর্মচারী, জায়গীরদার, আয়মাদার, ইজারাদার, লাখেরাজদার ও সৈনিকগণ সম্পদশালী ছিলেন। ফলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা তাঁদের পক্ষে কোন সমস্যা ছিল না। এমনকি সামান্য সম্পদের অধিকারী মুসলমানরাও মসজিদ-সংলগ্ন মক্তবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মক্তবের ব্যয়ভার হয়ত রাষ্ট্র থেকে নয়ত স্থানীয় অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জমিদান ইত্যাদি থেকে বহন করা হতো।

মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে ও মসজিদে। সাধারণত প্রত্যেক শহরেই মসজিদ ছিল এমনকি ক্ষুদ্র গ্রামেও যেখানে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান বাস করত সেখানে অন্তত একটি মসজিদ থাকত। প্রত্যেক মসজিদ-সংলগ্ন স্থানে সাধারণত মক্তব পরিচালিত হতো। আবার কখনো কখনো এই সব মক্তব ধনী-ব্যক্তিদের বাড়ি-সংলগ্ন স্থানে পরিচালিত হতো। শরীয়তের অনুশাসনে সাত বছর থেকে একজন মুসলমান বালক ও বালিকার উপর নামায এবং ইসলামের অন্যান্য রুকন পালন ফরয হয়। ইসলামের এই সব কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে একজন শিশুর অন্তত দু'বছর সময় প্রয়োজন। কাজেই এটি ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, একটি শিশুকে পাঁচ বছর বয়সের সময় মক্তব কিংবা মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়, যাতে সে দু'বছর সময়ের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও প্রারম্ভিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। মুসলমান সমাজে বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর, চার মাস, চার দিন বয়সে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহ-খানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল।[১] মোট কথা চার

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

বা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে একজন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব বা মসজিদে প্রবেশ করত।

মুসলিম শিশুদের জন্য মক্তব বা মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হতো ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে। মসজিদের ইমাম শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন। মুসলিম শাসনামলে সমকালীন সাহিত্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হিন্দু কবি মুকুন্দ রাম তার 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলেমেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলবিগণ শিক্ষা দিতেন।"[২] সেখানে আরো উল্লিখিত হয়েছে যে, মৌলবিগণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ওযূ ও নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।[৩] এতে আরো জানা যায় যে, মক্তবে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অবগত হতে হলে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করা অপরিহার্য। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কুরআন ও হাদীসের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইসলামে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হলে ফিকহ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞান পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআন ও হাদীসকে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে মুজতাহিদ বা আইন বিশেষজ্ঞরা যাবতীয় সমস্যার সমাধান দান করে যে ব্যবহারিক শাস্ত্রের সূত্রপাত করেছেন তাকে ফিকহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কুরআন ও হাদীসে এমন গভীর অভিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না যা দিয়ে প্রতিটি সমস্যার শরীয়ত-সম্মত সমাধান করে অনুশাসন পালন করতে পারে। এজন্যে ফিকহ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তা হলে বলা যায় যে, বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। মসজিদ ও মক্তবে এসব বিষয়ের উপর পাঠদান করা হতো। সেখানে কুরআনের কিছু আয়াত মুখস্থ করার একটি সাধারণ রীতিও প্রচলিত ছিল, যা ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন মুনাজাতে প্রয়োজন হতো। এছাড়া সুচারু লিখন-পদ্ধতির চর্চা করা হতো এবং কোন ছাত্র যদি শিল্পকলার শিক্ষালাভে আগ্রহী হতো, তাহলে তাকে একজন ওস্তাদ বা শিক্ষকের কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রেরণ করা হতো।

বাংলার সমগ্র মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে আরবি, ফার্সী ও বাংলা– এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হতো। কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য আরবি ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সমগ্র মুসলিম শাসনামলে ফার্সী ছিল রাজদরবারের ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা। সুতরাং রাজ-সরকারে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি-বাকরির জন্য ফার্সী ভাষা অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। উপরন্তু ফার্সী ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচিত হতো। কাজেই এই সব গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য ফার্সী ভাষা শিখতে হতো। বাংলা ভাষা বহু মুসলমান ও অমুসলমানদের মাতৃভাষা ছিল। ফলে বাঙালি মুসলমানগণ মাতৃভাষা শিক্ষাকে অবহেলা করতে পারেন নাই। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে যে চীন

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দেশীয় দূত বাংলার সুলতানদের দরবারে আগমন করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশে ফার্সী ও বাংলা এ দুটো ভাষাই দেখতে পেয়েছিলেন। চৈনিক দূত মাহুয়ান বাংলার ভাষা সম্পর্কে বলেন, "জনগণের ভাষা বাংলা। ফার্সীও এখানে বলা হয়।"[৪] প্রকৃতপক্ষে মুসলমান শাসনকর্তাগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে বাংলা ভাষা বাংলার সুলতানী আমলে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। বহু মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুসলিম আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে এবং আরবি, ফার্সী ও বাংলা ভাষা হিসেবে ছাত্রদের পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর আসে ছাত্রদের জন্য প্রাগ্রসর (মাধ্যমিক) শিক্ষা। উন্নতমানের মাদ্রাসায় প্রাগ্রসর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মূল বিষয় আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী করে প্রাগ্রসর ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করা হতো। কাজেই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের তাশরীহ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় ও সমস্যার উপর কুরআন ও হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত ও যুক্তি দিয়ে পেশ করতে ইজতিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নবী করীম (সা) মুয়াজ বিন জাবালকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময় কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না এমন বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদের মাধ্যমে মত পেশ করার অভিপ্রায়কে প্রশংসা করেছিলেন।[৫] সুতরাং প্রাগ্রসর শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসেবে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা তথা আইনশাস্ত্র অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এসব বিষয় ছাড়াও লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন– যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, আল-কেমী বা রসায়ন, হিনদাসা বা জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, তারীখ বা ইতিহাস এবং আরো অনুরূপ বিষয়ও প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে সম্রাট আকবরের দরবারি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয় বিদ্যা, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অংকশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত; এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে।"[৬] আবুল ফজলের বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সময়ে বাংলার মাদ্রাসাসমূহে এই সমস্ত বিষয় পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করা বা পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বাধ্য ছিল না। অর্থাৎ নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে প্রাগ্রসর শিক্ষার্থিগণ এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ লাভ করত।

পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত ত্রিবেণী, দরসবাড়ী, হযরত পাণ্ডুয়া, মহিসুন, বাঘা এবং সোনারগাঁ মাদ্রাসাসমূহকে প্রথম শ্রেণীর মাদ্রাসা বা উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

করা যায়। এই সমস্ত শিক্ষায়তনে মাধ্যমিক স্তরের পঠিতব্য বিষয়সমূহ ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা শবব্যবচ্ছেদ ও শরীর-কাঠামো বিদ্যা পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। গৌড়ের মাহদীপুরস্থ গুণমনত মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহকে (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিঃ) "কুরআন শরীফের রহস্য উদঘাটনকারী এবং ধর্মীয় ও শারীরিক বিদ্যায় (চিকিৎসাবিদ্যা) পারদর্শী" [revealer of the secrets of the Quran, Learned in all branches of learning, both as regards religion and the (care of) bodies (i. e. a physician)] সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭] সুলতান সম্পর্কে এই গুণাবলীর প্রয়োগ নির্দেশ করে যে, বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনে তাফসীর, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং শারীর বিজ্ঞান পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। উচ্চশিক্ষার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এই উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে 'গ্রীক' ও 'ইরানী' চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন করা হতো এবং এই শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চালান হতো। 'সফরনামা' গ্রন্থে আমির সাহাবুদ্দীন হাকিম কিরমানী নামক চতুর্দশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করায় তিনি 'চিকিৎসকদের গৌরব' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন।[৮] মীর্জা নাথানের সময়ে কবিরাজ শ্রেণীর চিকিৎসক ছাড়াও বহু চিকিৎসককে এই প্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত দেখা যায়। 'বাহারীস্তান-ই-গায়বী'র লেখক মীর্জা নাথান বলেন যে, তার পিতা ইহতিমাম খান ঘোড়াঘাটে দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিরাময়ের জন্য বহু চিকিৎসক ডাকা হয়।[৯] ঐ সূত্রে আরো জানা যায়, হেকিম কুদ্‌সী নামক জনৈক চিকিৎসক বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের চিকিৎসা করেছিলেন।[১০] 'সুব-ই-সাদিক' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মীর আলাউল মুলক চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়াদিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং উল্লিখিত গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ সাদিকের সময়ে তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) অধিবাসী ছিলেন।[১১]

উপরোক্ত পাঠ্যবিষয় ছাড়াও তীর চালনা ও যুদ্ধ কৌশল বিদ্যা বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। তবে এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতো। মুহম্মদ বুদাই কর্তৃক রচিত 'হিদায়াত আর-রামী' বা তীর চালনার নির্দেশিকা প্রমাণ করে যে, তীর চালনা বিদ্যা এদেশের মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল।[১২] বাংলার মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যে বলা যায় যে, ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩]

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এখানে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ও পাঠ্য-তালিকাসমূহ প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ ও উলামা সম্প্রদায়,

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

যাঁরা এই প্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন করেন বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা ঐ একই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কাজেই তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এর কিছুটা রদবদল করে কিংবা না করেই তা মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বত্র অনুসরণ করেন। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসনামলে এ প্রদেশে পীর-দরবেশ, উলামা ও শিক্ষকদের অধিকাংশই আরব ও পারস্য থেকে এসেছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র – মাদ্রাসাসমূহে পঠিতব্য বিষয়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আরবি ও ফার্সী ভাষার উপর পূর্ণ দখল অর্জন করতে না পারলে ঐসব বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়, আর সে কারণেই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের কার্যক্রমে মাদ্রাসা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সাধারণ জনগণকে সে সবের শিক্ষাদান করেছেন। এমনিভাবে পরিবার ছাড়াও সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু এসব মাদ্রাসায় তালীম পেয়ে যেসব আলিম বের হয়েছেন তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম চালু রেখেছেন। বিগত দিনগুলোতে মুসলিম সমাজে যেসব অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনুসারে অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে আলিমগণ সোচ্চার হয়েছেন এবং দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এইভাবে মাদ্রাসা প্রকৃত আলিম তৈরির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার, ইসলামী জীবনবোধ জাগ্রত করা এবং সমাজ সংস্কারের কার্যক্রম অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থাতেও অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সময়েও শত বাধা-বিপত্তির মুখে মাদ্রাসা তার ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে এবং আলিমগণ অশুভ শক্তির গতিরোধ করে মুসলিম সমাজকে ইসলামী জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

তথ্য নির্দেশ

১. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ২১৪।

২. "যত শিশু মুসলমান তুলিলা মক্তব স্থান, মকদুম পড়ায় পাঠনা।" মুকুন্দ রাম– চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ৩৩৪, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২৪০।

৩. "শিখা এ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজ।" বিপ্রদাস– মনসামঙ্গল, পৃ. ৬৭, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২৪১।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

৪. মাহুয়ানের বিবরণের জন্য দেখুন ঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম (মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত), ঢাকা, আইসি বিএস, ১৯৯৭, পৃ. ১২১।

5. S. A. Q. Husaini, Arab Administration, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1948, p. 20.

৬. Abul Fadl, Ain-i-Akbari, vol-I, Tr. H. Blochman, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1904, p. 110.

৭. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, Rajshahi, varendra Research Museum, 1960, p. 123.

৮. দ্রষ্টব্য ঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৯. মীর্জা নাথান, বাহারীস্তান-ই-গায়বী, (খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত) ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ৩২-৩৩।

১০. ঐ, পৃ. ২৪১।

১১. দ্রষ্টব্য ঃ এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২২।

১২. A. Karim, Social History of the Muslims in Bengal, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1959, p. 80.

১৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv.

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

চতুর্থ অধ্যায়

মাদ্রাসার আবাসিক মর্যাদা, সম্পত্তিদান ও আলিমদের মর্যাদা

পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল মাদ্রাসার কথা আলোচনা করা হয়েছে, এর সবগুলোই আবাসিক মাদ্রাসা ছিল বলে ধারণা করা যায়, যেখানে শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেরই মাদ্রাসায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সোনারগাঁ-এর মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার মাদ্রাসা যে আবাসিক ছিল তার প্রমাণ শরফউদ্দীন এহিয়া মানেরীর জীবনের একটি ঘটনা থেকে জানা যায়। কথিত আছে যে, মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষক একই দস্তরখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন। এতে অনেক সময় ব্যয় হতো। শরফউদ্দীন এহিয়া মানেরী বিদ্যা অর্জনের দিকে এতই মনোযোগী ছিলেন যে, তিনি এতটুকু সময়ও অপচয় পছন্দ করলেন না এবং একই দস্তরখানে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এতে অনেক সময় তাঁকে অভুক্ত থাকতে হতো। তাঁর শিক্ষক শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামা একথা জানতেই তাঁর খাবার ভিন্নভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।[১] ত্রিবেণীতে (ফিরোজাবাদ) জাফর খানের মাদ্রাসা আবাসিক হওয়ার প্রমাণ ঐ শিলালিপিতেই পাওয়া যায়। এতে কাজী নাসির মুহম্মদ আহল-উল-ফজল-এর সকলের জীবিকার ব্যবস্থার জন্য তাঁর বিরাট অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। আহল-উল-ফজল বলতে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য কর্মচারী সকলকেই বুঝানো হয়েছে। শিলালিপিতে আরো উল্লেখ আছে যে, 'তিনি (কাজী নাসির মুহম্মদ) কর্মচারীদের গালিচাও দিয়েছেন।'[২] এর অর্থ এই যে, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই বিনা খরচে আবাসিক সুবিধা পেত। সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (গণেশ পুত্র) শিলালিপিতেও তালিব-উল-ইল্‌ম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মাদ্রাসাখানি আবাসিক প্রতিষ্ঠানরূপে নির্মাণ করা হয়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরসবাড়ী মাদ্রাসার গঠনপ্রণালী এখন জানা যায়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খনন করে এই মাদ্রাসার ভিত্তি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। এই মাদ্রাসার গঠন প্রণালী নিম্নরূপ ঃ[৩]

মাদ্রাসা ঘরটি বর্গাকৃতির, প্রত্যেক বাহু বা প্রত্যেক পার্শ্বে ১৬৯ ফুট লম্বা। চতুর্দিকে কক্ষ রয়েছে এবং মাঝখানে একটি আঙিনা রয়েছে, আঙিনার দৈর্ঘ্য ১২৩ ফুট ও প্রস্থ ১২৩ ফুট। চতুর্দিকের কক্ষগুলোর মোট সংখ্যা ৪০ এবং প্রত্যেক কক্ষ ১১´-৪´ লম্বা

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

এবং ১১-৪" চওড়া। এখানে একটি মসজিদও রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট এবং প্রস্থ ১৬ ফুট। মাদ্রাসার বাইরে পুকুর ছিল, সেখানে ওযূ এবং গোসল করার ব্যবস্থা ছিল, পুকুরের চারপাশে কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পুকুরে নামবার ঘাটের ব্যবস্থাও ছিল। মাদ্রাসার চৌহদ্দি যে অনেক দূরে বিস্তৃত ছিল তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণেই পাওয়া যায়। এই বিবরণের লেখক জনাব আবদুল কাদির বলেন ঃ[৪]

The inmates of the Madrasah, the teachers, students and other employees, probably used both the smaller pond on the east and the larger water tank on the west....., The northern bank of the larger tank (dighi) and also parts of its western and eastern leanks beyond the masonary ghat and the connected pathway, and probably also the area west of the Madrasah bordering the eastern bank appear to conceal substantial cultural accumulation which also require to be carefully examined by systemic excavations. These area were possibly occupied by same sections of the Madrasah establishment. The southern bank also contained cultural debris but its destruction is complete now.

হাওদা মিয়ার (প্রকৃত নাম শাহ্ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ) বাঘা মাদ্রাসাও একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল, আবদুল লতিফের বিবরণে জানা যায়। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে যখন পরিব্রাজক আবদুল লতিফ বাঘা মাদ্রাসা দেখেন তখন তা একটি খড়ের ঘর ছিল। কিন্তু আকৃতিতে তা অনেক বড় ছিল,[৫] যাতে মনে হয় এই মাদ্রাসাও আবাসিক ছিল। বাঘা মাদ্রাসা ইংরেজ আমল পর্যন্ত আদি পাঠ্যসূচিতেই চালু ছিল। এডওয়ার্ড এডাম বাংলার প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির সময় বাঘায় যান এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট লেখেন। তাঁর রিপোর্টে জানা যায়, ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে থাকা, খাওয়া, পোশাক, ধোপা খরচ, তৈল এবং কাগজ-কলম ইত্যাদি পেত।[৬] এ ছাড়া বাঘা মাদ্রাসার প্রথম এবং প্রধান মুদাররিস মাওলানা শের আলী এবং দু'জন ইরানী শিক্ষকের মাজার বাঘা মাদ্রাসা চত্বরে রয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, বাঘা মাদ্রাসা একটি পূর্ণ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল।

আর্থিক অনুদান ও ভূ-সম্পত্তি দান

উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহ বাংলার মুসলিম শাসকদের আর্থিক অনুদান এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। বিভিন্ন লিপির সূত্রে এবং সমসাময়িক কালে রচিত গ্রন্থাদির সূত্রে বলা যায় যে, বাংলার মুসলিম শাসকগণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করে উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছেন।[৭] পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত জাফর খানের (ত্রিবেণী) মাদ্রাসা, জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

(সুলতানগঞ্জ) মাদ্রাসা, আলা উদ্দীন হোসেন শাহের (দরসবাড়ী) মাদ্রাসা, মাওলানা তাকী উদ্দীন আল আরবীর (মহিসুন) মাদ্রাসা, হাওদা মিয়ার (বাঘা) মাদ্রাসা প্রত্যেকটিতে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করা হয়েছিল। কিন্তু মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁ মাদ্রাসা সম্পর্কে এরূপ কোনো দানের কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলার সুলতানেরা আলিম, উলামা এবং সৈয়দ-সূফীকে যেভাবে ইনাম, মিল্ক এবং মদদ-ই-মাশ দিতেন– তাতে ধারণা করা যায় যে, তিনিও হয়ত মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। বাংলার সুলতানরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রতিষ্ঠাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] এছাড়া পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত শিলালিপিতে মাদ্রাসাকে দার-উল-খয়রাত বা বিনা-উল-খয়রাত বলা হয়েছে। এতে মনে হয়, রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি মঞ্জুরির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দানশীল লোকেরাও মাদ্রাসার জন্য এবং বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষকের জন্য ভূমি দান বা অর্থ ব্যয় করতেন। বিশেষ করে জাফর খানের ত্রিবেণী মাদ্রাসার শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, কাজী নাসির মুহাম্মদ তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ব্যয় করেন। বাঘাস্থ হাওদা মিয়া মদদ-ই-মাশ হিসেবে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। কথিত আছে যে, তাঁর বংশধররা ২২টি গ্রাম ওয়াক্ফ হিসেবে লাভ করেন, আবার কারো কারো মতে, তাঁরা ৪২টি গ্রাম মদদ-ই-মাশ হিসেবে লাভ করেন।[৯] ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এডাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেন, "কসবা বাঘায় অবস্থিত মাদ্রাসাটি বহুদিনের একটি বৃত্তিভোগী প্রতিষ্ঠান। প্রতীয়মান হয় সম্পত্তিটার প্রথমত দুটি অংশ ছিল, যা দুটি পৃথক পৃথক সরকারী মঞ্জুরির দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের উনিশতম বছরে একটি সনদে মাদ্রাসাকে মদদ-ই-মাশ রূপে পূর্ব পদ ও ভূমিদানের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং যাকে শাহজাহানের সনদটি দেয়া হয়েছিল সেই শেখ আবদুল ওহাবকে মাওলানা উপাধি প্রদান করা হয়।"[১০] অনুরূপ মহিসুন (চতুর্দশ শতাব্দীতে বারবকাবাদ নামে পরিচিত) মাদ্রাসাটিতেও প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করা হয়েছিল। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় যে, মহিসুনের (স্থানীয়ভাবে মাইগঞ্জ নামে পরিচিত) মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৭৫০ বিঘা লাখেরাজ ভূমি অনুদান হিসেবে মুসলিম শাসন আমল থেকে চলে আসছিল, এমনকি তা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল।[১১] ব্রিটিশ শাসন আমলে ক্রমান্বয়ে তা রদ হয়ে যায়। মহিসুন দরগার বর্তমান খাদিমদার (স্থানীয়ভাবে চেরাগী বলে পরিচিত)-এর বিবরণে জানা যায় যে, ঐ বিশাল ভূ-সম্পত্তির সামান্যতম অংশ তিনি খাদিমদার সূত্রে এখনও ভোগদখল করে যাচ্ছেন।[১২] ব্রিটিশ সরকারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন আমলে ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নামে অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[১৩] এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, মুসলিম শাসন আমলে বাংলার উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহ পূর্ণ সরকারী

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

অনুদানে পরিচালিত হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যাবতীয় খরচ মুসলিম প্রশাসন বহন করেছে।

আলিমদের মর্যাদা

পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত শিলালিপিগুলোতে আলিমদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জাফর খানের ত্রিবেণী মাদ্রাসার শিলালিপিতে জাফর খান আইনবিদ অর্থাৎ ফুকাহাদের দোয়া কামনা করেছেন। আরো বলা হয়েছে যে, জাফর খান শরীয়তের আলিমদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পণ্ডিত এবং জ্ঞানীরা ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরসবাড়ী মাদ্রাসার শিলালিপিতে আলিমদের অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এমন কি আলিমদের আশ্রয়দানকারী এবং আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মীনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর তবকাত-ই-নাসিরীতে আলিম, শেখ এবং সৈয়দ প্রমুখ আহল-ই-খাইরকে বৃত্তি ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১৪] প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসন আমলে, বিশেষ করে দিল্লী এবং বাংলার সুলতানী আমলে আলিম, শেখ এবং সৈয়দ অর্থাৎ আহল-ই-খাইর বা আহল-ই-ফজল-এর লোকেরা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সমাজের উচ্চ স্তরের লোক। তাঁরা আহল-ই-সাদাত বা আহল-ই-কলম নামে ও আহল-ই-কলম-এর সৈয়দগণ টুপি পরতেন, তাঁদেরকে 'কুলাহদারান' বলা হতো; আলিমগণ দস্তার বা পাগড়ি পরতেন, তাঁদেরকে বলা হতো 'দস্তার বন্দান'। সূফীরাও দস্তার পরতেন, কারণ তাঁরাও ছিলেন আলিম; তখনকার দিনে শরীয়তে পারদর্শী না হলে সাধারণত সূফীরা খেলাফতনামা বা ইজাজতনামা দিতেন না।[১৫] আলিমগণ তখন অত্যন্ত মর্যাদাশীল এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন আইনের প্রবক্তা। সুলতানগণ বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। সদর, সদর-উস-সুদূর, কাজী, শেখ-উল-ইসলাম, শিক্ষকতা, ইমামত এবং খিতাবতের সমুদয় পদ তাঁরাই অধিকার করতেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে আলিমদের যে সম্মান ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা সারা মুসলমান শাসন আমলে আলিমদের উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তথ্য নির্দেশ

১. উটফডর্লট রণশধণষ, ১৯৩৯, য. ১৯৭; এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১১৭।

২. ও. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, Rajshahi, varendra Research Museum, 1960, p. ১৯, ৪ নং লাইন দ্রষ্টব্য।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ রিপোর্ট, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৭৬, উদ্ধৃত ঃ আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২৩৩।

৪. উদ্ধৃত, ঐ।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

৫. আবদুল লতিফের বিবরণের জন্য দেখুন, ঐ, পৃ. ১৯-২৬।

৬. W. Adam, second report on the state of education in Bengal (Rajshahi District), Calcutta, ১৮৩৬, যয. ১১২-১৬.

৭. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, pp. ১৯-২০, ২৮-২৯, ৪৭-৪৮, ১৫৯; Islamic studies Islamabad, vol-xxiv, ৪, য. ৪৩৪-৩৫, ৪৪৩; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২, পৃ. ৫৬।

৮. বিস্তারিত আলোচনা দেখুন ঃ Abdul Karim, social History of the Muslim in Bengal, 2nd edi, 1985, 4th chapter, section-A.

৯. ঐ, pp. 150-51.

১০. W. Adam, report on the state of education in Bengal, ১৮৩৫-৩৬, য. ১৬১.

১১. Islamic studies, vol-xxiv, 4, p. 434; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহীতে ইসলাম, পৃ. ৫৬।

১২. মোঃ আবদুল করিম, মাহী সন্তোষের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯; এই গ্রন্থের ৪০ নং পৃষ্ঠায় বর্তমান খাদিমদারের বংশানুক্রমিক তালিকা দেওয়া আছে।

১৩. W. W. Hunter, Indian Musalmans, London, ১৮৭১, য. ১৭৭.

১৪. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৫৬।

১৫. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২৩৫।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সমাবেশ—Religious Complex

সাধারণত দেখা গেছে, মুসলমান শাসন আমলে বিশেষত বাংলার সুলতানী আমলে যেখানেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতো, সেখানেই একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সমষ্টি বা ৗণফধথথধমল্র উমবযফণস নির্মাণ করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, সরাই বা মুসাফিরখানা এবং মাজার বা মাকবারা থাকত। সাধারণভাবে ইবাদতের জন্য মসজিদ, জ্ঞান-অর্জন ও পঠন-পাঠনের জন্য মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য খানকা, মুসাফিরদের থাকার জন্য সরাই বা মুসাফিরখানা এবং মৃত ব্যক্তির কবরের উপর মাকবারা নির্মাণ করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এসব ইমারত ধর্মীয় স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত।

যা হোক, কোনো কোনো সময় শুধু মসজিদ এবং মাদ্রাসা নিয়েই একটি Religious Complex গড়ে উঠত। মসজিদ প্রায় সময়েই মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হতো। বিশেষত মসজিদে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করার রেওয়াজ বর্তমানেও এদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। আর মাদ্রাসা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই মসজিদ অবশ্যই থাকতে হয়। এই মসজিদ হয় কোনো আলাদা ভবনে বা মাদ্রাসা ভবনের একাংশেও হতে পারে। পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, সাধারণত সৈয়দ, আলিম এবং সূফীরাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন বেশি, কারণ আলিমগণ শিক্ষাদান কাজকে তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরবীয় মহিসুন মাদ্রাসা, মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁ মাদ্রাসা, হাওদা মিয়ার বাঘা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আলিমগণ শিক্ষাদান কাজকে পারলৌকিক কর্তব্য হিসেবেও গ্রহণ করতেন।

সূফীরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে সঙ্গে সঙ্গে খানকা তৈরি করার রেওয়াজও ছিল। কারণ তাঁরা শরীয়ত শিক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারেফাতও শিক্ষা দিতেন। বিশিষ্ট আলিম এবং সূফীদের মাজারও একই Complex-এ থাকতো। মাওলানা শরফউদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে শায়িত আছেন।[১] মাওলানা হাওদা মিয়া এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির মাজার বাঘায় রয়েছে।[২] মধ্যযুগে মুসাফিরদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হতো। এখনো কালে- ভদ্রে শোনা যায়। তাই সরাই বা মুসাফিরখানা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হতো। সমগ্র মুসলিম আমলে

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহরে সরাইখানা নির্মিত হতো। মুসলমান শাসকগণ এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুলতানী আমলে সরাই এবং মুঘল আমলে কাটরা বলা হতো। শেরশাহের সরাই প্রকল্প সুলতানী আমলের সারা ভারত-উপমহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা বা মুর্শিদাবাদের কাটরা মুঘল শাসকদের কীর্তি। শাহ শুজা, শায়েস্তা খান এবং মুর্শিদকুলী খান এগুলো নির্মাণ করেন। শেরশাহের প্রত্যেক সরাই-এর সঙ্গে মসজিদের ব্যবস্থাও ছিল। ফলে শেরশাহের সরাইখানা প্রকল্প ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি বা ৎণফধথধমল্র উমবযফণস এ পরিণত হয়।

জাফর খানের ত্রিবেণীস্থ মাদ্রাসার স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মাজার নিয়ে উমবযফণস গঠিত হয়। এটা ঠিক যে, জাফর খানের মাদ্রাসার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি, কিন্তু শিলালিপি দু'টি আবিষ্কৃত হয়েছে; একটি তাঁর মসজিদের দেওয়ালে, অপরটি তাঁর মাজারে। এতে মনে হয়, মাদ্রাসা দু'টি ধ্বংস হওয়ার পর উভয় শিলালিপি স্থানচ্যুত হয়ে মসজিদ এবং মাজারে স্থাপিত হয়। মাওলানা তাকী উদ্দীন আল-আরবীর মহিসুন মাদ্রাসার স্থান নির্দেশ আর সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু মহিসুন (বারবকাবাদ শহর) থেকে চারটি মসজিদের শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া এখানে বাংলার দ্বিতীয় শাসক শিরান খলজীসহ সোহরাওয়ার্দী তরিকার অনেক সূফী-দরবেশ শায়িত আছেন।[৩] ফলে মহিসুন একটি ৎণফধথধমল্র উমবযফণস বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি ছিল। সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসাও মসজিদ-সংলগ্ন ছিল বলেই মনে হয়। কারণ এর শিলালিপিও মসজিদেই আবিষ্কৃত হয়েছে। মাওলানা শরফ উদ্দীন আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁ মাদ্রাসার চত্বরে মসজিদ এবং খানকা ছিল, যদিও এ বিষয়ে লিখিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না। মাওলানা শরফ উদ্দীন আবূ তাওয়ামা একজন উচ্চস্তরের সূফী ছিলেন। শেখ শরফ উদ্দীন এহিয়া মানেরী তাঁর কাছে তাসাউফ-এ দীক্ষা লাভ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরসবাড়ী মাদ্রাসায় নামাযের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়, যদিও এর কাছেই সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মসজিদখানি অবস্থিত ছিল এবং এর শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪] বাঘাস্থ হাওদা মিয়ার মাদ্রাসার কাছেই বর্তমানেও অবস্থিত একখানি শাহী মসজিদ। সুলতান নুসরত শাহ ১৫২৩/২৪ খ্রিস্টাব্দে মসজিদখানি নির্মাণ করেন।[৫] তাছাড়া হাওদা মিয়া এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রাদি এখানে শায়িত আছেন, একথা আগেও বলা হয়েছে। ফলে বাঘাও একটি ৎণফধথধমল্র উমবযফণস বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি ছিল।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মুসলিম আলিম, সূফী, সৈয়দ ইত্যাদি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও বাংলায় আগমন করে ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। একদিকে শাসকগোষ্ঠী যেমন রাজ্য বিস্তারে এবং শাসন ব্যাপারে সক্রিয় হন, অন্যদিকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মুসলিম সমাজ গঠনে এবং মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে লিপ্ত হন। বিভিন্ন সূত্রে দেখা যায় যে, বাংলায়

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা নির্মিত হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মসজিদ এবং ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য মাদ্রাসা অপরিহার্য। এই দুইরকম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ স্বাভাবিক, কিন্তু মসজিদ, মাদ্রাসা ছাড়াও সূফীদের ব্যবহারের জন্য খানকা নির্মাণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।* মীনহাজের লিখিত বক্তব্য ছাড়াও খানকা নির্মাণের তথ্য শিলালিপিতে পাওয়া যায়, শিলালিপির সাক্ষ্য মীনহাজের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এ থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার্থীদের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা গড়ে উঠতে পারে।

* বলা হয়ে থাকে, সূফীদের খানকা, 'পৃথিবীতে শান্তির আধার' যেখানে সকলে 'নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করতে পারে।'

তথ্য নির্দেশ

১. আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র, সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬, পৃ. ৫০৮।

২. লেখকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ।

৩. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৮; আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮।

৪. S. Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, Rajshahi, varendra Research Museum, 1960, pp. 104-106.

৫. ঐ, pp. 212-214.

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

উপসংহার

একটি হাদীসে জানা যায়, "যদি কোনও লোক মারা যায় তাঁর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি কর্মফল চালু থাকে। ১ম. সদকায়ে জারিয়া, ২য়. যেই ইল্‌ম বা শিক্ষা থেকে মানুষের উপকার হয়, ৩য়. সৎ সন্তান যে তাঁর জন্য দোয়া করে।"

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে শিক্ষা দান কাজ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে সকল মুসলমান মনে করে থাকেন। পূর্বে যেমন শিক্ষাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো, এখনো তাই মনে করা হয়। পূর্বে যেমন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন এখনও তাই করেন। তবে যুগের পরিবর্তনের ফলে এর প্রয়োগেরও অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আলিমদের আগের মর্যাদা বা সম্মান এখন আর নেই। এর প্রধান কারণ রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তন। পূর্বকালে সুলতানেরা শাসন কাজকেও ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন; মোটামুটিভাবে সালতানাতকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। ফলে রাষ্ট্রীয় কাজেও শেখ, সৈয়দ, আলিমদের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। কাজী, সদর, সদর-উস-সুদূর, শেখ-উল-ইসলাম পদ এখন নেই। সুতরাং আলিমদের উচ্চ মর্যাদার এই পদটি একেবারেই বন্ধ। যেহেতু রাষ্ট্র ইসলামী নয়, ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার জন্য আলিমদের আর ডাক পড়ে না। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে এদেশের আলিম সমাজ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পর্যুদস্ত।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান শাসন আমলে আলিমদের নিজ নিজ কাজে, শিক্ষাদানে বা গবেষণায় প্রচুর স্বাধীনতা ছিল। ইনাম, মিল্ক এবং মদদ-ই-মা'শ তাঁদের যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করতো, শিক্ষাদান কাজেও তাঁদের স্বাধীনতা দান করতো। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকরাই ছিলেন প্রধানতম বিচারক। শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষাগত মানে সন্তুষ্ট হলেই তিনি ছাত্রদের সার্টিফিকেট বা দস্তার বা ইজাজত দিতেন। কোন রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা বা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীরা জানত যে, শিক্ষকেরাই তাদের মান যাচাই করার একমাত্র কর্তা। এই পরীক্ষায় পাশের জন্য বাছাই করে পড়ার বা নকল করার বা অন্য কথায় ফাঁকি দেওয়ার কোন অবকাশ ছিল না।

সেকাল আর একাল, সময় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষারও অনেক সংস্কার হয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায় এসে পড়েছে যে, আধুনিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আরও সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এমন কিছু মাদ্রাসা কি গঠন করা প্রয়োজন নয়, যেখানে ইসলামী জ্ঞান-

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কুরআনের গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে শিক্ষকরা মতামতের দিক দিয়ে থাকবেন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আর্থিকভাবে থাকবেন ভাবনাহীন, যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি থাকবে না, কিন্তু সেখান থেকে বের হবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা-পণ্ডিত। এমনিতেই আমাদের দেশে শিক্ষার মান অনেক নীচু হয়ে গেছে, দিনে দিনে আরও নীচু হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে, ইতিমধ্যেই আরবি, ফার্সী এবং উর্দু শিক্ষার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে গেছে। প্রায় অভিযোগ শোনা যায়॥ভাল মুহাদ্দিস বা মুফাস্‌সির-এর অভাব দেখা দিয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, দুনিয়ালোভী আলিম বা শিক্ষকগণ ব্যতিক্রমধর্মী কার্যকলাপের জন্য নিন্দা ও ধিক্কার লাভ করে আসছে। এসব ব্যক্তি অবশ্যই ওলামা সূ-এর পর্যায়ভুক্ত এবং আল্লাহ পাকের কাছে তারা মর্যাদাবান নন। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

উল্লেখ্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন কি নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা থেকেও মুখ ফিরিয়ে কেবল প্রাচীন কিছু কিতাব পড়ানোর জন্য কিছু প্রচলিত মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে কোন সুপরিকল্পিত সিলেবাস নেই এবং সরকারী সহায়তায় সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে সমাজ উন্নয়নের অনুষঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলার কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই। এই সব মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের দেখা যায় সবাই প্রথম শ্রেণী পায় এবং তাদের মধ্যে এমনও অনেক ছাত্র থাকে যারা নিজের আরবী সার্টিফিকেট পর্যন্ত পড়তে পারে না। এ সব ছাত্র লেখাপড়া শেষে সমাজে কোন সুনির্দিষ্ট কাজ না পেয়ে হতাশায় ঘুরপাক খেতে থাকে এবং খামাখা ফতোয়াবাজী করে বেড়ায়। এ ক্ষেত্রে নকল বন্ধ করে, শিক্ষকের মান নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার একক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। (বি. স.)

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

গ্রন্থপঞ্জি

ক. ইংরেজি গ্রন্থাবলি

Allami, Abul Fadl, Ain-i-Akbari, vol-1, Tr. H. Blochmann, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1904.

Husaini, S. A. Q, Arab Administration, Lahore, sh. Muhammad Ashraf, 1948.

Qureshi, I. H, Administration of the sultanate of Dehli, 4th. edi., Karachi, Pakistan Historical society, 1958.

Ahmed. S., Inscriptions of Bengal, vol-iv, Rajshahi, varendra Research Museum, 1960.

Karim. A., Social History of the Muslims in Bengal, Dacca, Asiatic society of pakistan, 1959. corpus of the Muslim coins of Bengal, Down to 1538 A. D., Dacca, Asiatic society of Pakistan, 1960.

Hunter. W. W.,Indian Musalmans, London, 1871.

Sarkar. J. N (edi), History of Bengal, vol-II, 3rd impression, Dacca, University of Dacca, 1976.

Ali. A. K. M. Yaqub, Aspects of society and Culture of the varendra, Rajshahi, M. Sajjadur Rahim, 1998.

Arnold, T. W., The preaching of Islam, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, Reprint, 1956.

Adam, W., Report on the state of education in Bengal, Calcutta, Bengal Military orphan press, 1835, 1838.

Salim, Ghulam Riyad-al-salatin, Tr. Abdus Salam, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1904.

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

Dani, A. H., Biblography of the Muslim Inscriptions of Bengal, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1957.

Fazli Robbe. K., The origin of the Musalmans of Bengal, Calcutta, Thacker spink & co. 1895.

Tarafder, M. R., Husain shahi Bengal, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1965.

Khan, Abid Ali, Memoirs of Gaur and Pandua, ed., H. E. stapleton, Calcutta, Bengal seeretariat Book Depot, 1930.

Ali, A.K.M. Ayyab, History of Traditional Islamic education in Bangladesh (Down to A. D. 1980), Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1983.

খ. ইংরেজি প্রবন্ধাবলি

Damant, G. H. "Notes on shah Ismail Ghaji .... found at Kantaduor, Rangpur, J. A. S. B., vol-43, 1874.

Khan, A. M., "successors of Iktiyaruddin Muhammad Bakhtiyar Khalji", Indian culture, Calcutta, 1944.

Hossain, A. B. M., "Jahanabad Tomb", J. V. R. M., vol-3, Rajshahi, 1974.

"Kumarpure Town", J. V. R. M., vol-1, Rajshahi, 1972.

Karim, A., "A Fresh study of Abdul Latifs dairy, North Bengal in 1609 A. D.", J. I. B. S, vol-13, Rajshahi, 1990.

Roy, N. B., "The Muslim conquest of Bengal", Indian Historical Quarterly, vol-xvii, Calcutta, 1941.

Dani, A. H., "Early Muslim contract with Bengal", pp. H. C., Karachi, 1951.

Ali, A. K. M. Yakub, "Barind in the History of Muslim Bengal", J. P. H. S., Karachi, 1968.

গ. বাংলায় অনূদিত ফার্সী গ্রন্থাবলি

মীনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

আহমদ, খাজা নিযাম উদ্দীন, তবাকাত-ই-আকবরী, খণ্ড-১ (আহম্মদ ফজলুর রহমান) অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

বারণী, জিয়াউদ্দীন, তারীখ-ই-ফিরোজশাহী (গোলাম সামদানী কোরায়শী), অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

শেরওয়ানী, আব্বাস খান, তারীখ-ই-শের শাহী (মোহাম্মদ আলী চৌধুরী), অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

নাখান, মির্জা, বাহারীস্তান-ই-গায়বী (খালেকদাদ চৌধুরী) অনূদিত, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮। বাহারীস্তান-ই-গায়বী (খালেকদাদ চৌধুরী) অনূদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

ফিরিস্তা, আবুল কাশেম, তারীখ-ই-ফিরিস্তা, লাহোর, ১৯০৫।

ঘ. বাংলা গ্রন্থাবলি

করিম, আবদুল, বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

বাংলার ইতিহাস ঃ মোগল আমল, খণ্ড-১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএম, ১৯৯২।

মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

রহিম, এম. এ., বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, খণ্ড-১ (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, খণ্ড-২ (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি) অনূদিত, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব, মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখন শিল্প, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

রাজশাহীতে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

করিম, মোঃ আবদুল, মাহী সন্তোষের ইতিহাস, রাজশাহী, রাজশাহী বার্তা সম্পাদক, ১৯৯৬।

আকরম খাঁ, মোহাম্মদ, মোস্তফা চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫।

তালিব, মুহাম্মদ আবূ, উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী, গ্রন্থকার, ১৯৭৫।

হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (র)-এর জীবনেতিহাস, ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৮।

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত, বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম, (মোঃ রেজাউল করিম) অনূদিত, ঢাকা, আইসিবিএস-সিরিজ ১৩, ১৯৯৭।

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

সাকলায়েন, গোলাম, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

হক, এনামুল, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৯৪৮।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাঃ), বাংলাদেশের ইতিহাস, খণ্ড-২, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭।

রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ সন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, খণ্ড-২, ১ম দে'জ সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮।

নন্দী, সন্ধাকর, রামচরিত (রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য) সম্পাদিত, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ১৯৩৯।

ঙ. বাংলা প্রবন্ধাবলি

হোসেন, এ. বি. এম., "মাহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শন", ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, খণ্ড-১, ঢাকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ সন।

আহম্মদ, সুলতান, "বিবি পরীর মাজার", দেশকাল, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, জুন-জুলাই ১৯৭৮।

ইফাবা-২০০১-২০০২/প্র—৮০৪০—(উ)/-২২৫০

Our Telegram: https://t.me/BoierSomahar

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ